সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরআন করীমের আলোকে মহানবী (সা.)	২
মহানবী (সা.)-এর হাদীস	৩
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী	৪
জলসা সালনা কাদিয়ান ২০১৮ উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার কতৃক প্রদত্ত সমাপনী ভাষণ	৬
মহানবী (সাঃ) এর জীবনী- ওহোদের যুদ্ধের বিবরণ	১৪
আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শের আলোকে সন্তান প্রতিপালন	১৮
দরূদ শরীফের কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক প্রভাব	২৩

সম্পাদকীয়

আঁ হযরত (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব ঘটেছে 'খায়রূল বাশার' (পুরুষোত্তম) সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, নবী নেতা এবং 'খাতামান্নাবীঈন' রূপে। তিনিই হলেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, হে মহম্মদ! যদি তোমাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না থাকত, তবে আমি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিই করতাম না। তিনি (সা.) স্বয়ং বলেছেন اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ অর্থাৎ আমি আদম পরিবারের সর্দার। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে তাঁর ভালবাসা অর্জনের জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতাকে অনিবার্য করেছেন। তিনি কুরআন মজীদে তাঁর কর্মকে নিজের কর্ম এবং তাঁর বয়আতকে নিজের বয়আত রূপে অভিহিত করেছেন। নৈতিক গুণাবলীর সুউচ্চ মর্যাদায় তাঁর অধিষ্ঠিত হওয়ার সম্পর্কে আল্লাহ্ তালা স্বয়ং সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তিনি তাঁকে আধ্যাত্মিক জগতের আলোকোজ্জ্বল সূর্য বলে উল্লেখ করেছেন। মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালবাসার যতদূর সম্পর্ক, তা এতটাই প্রবল ছিল যে, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে মহম্মদ তুমি কি এই দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে যে এরা কেন ঈমান আনছে না। ঈমানহীনতার ফলশ্রুতিতে যে মহান সত্তার তত্ত্বজ্ঞান থেকে মানুষ বঞ্চিত ছিল, বস্তুত তিনি তাদের বঞ্চিত থাকার কারণেই মর্মাহত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি সম্পর্কে কল্পনা করা এবং তাঁর মহিমা ও উচ্চ মোকাম উপলব্ধি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁর সম্মান ও মর্যাদা যত উচ্চ ছিল সেই অনুপাতে তাঁর প্রতি শত্রুতাও তত বেশি করা হয়েছিল। সব থেকে বেশি গালি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। সব থেকে বেশি আপত্তি তাঁর সম্পর্কে করা হয়েছে। ইসলাম ও এর প্রবর্তকের সত্তা এবং কুরআন করীমের বিরুদ্ধে কোটি কোটি বইপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তিন হাজারের অধিক আপত্তি তাঁর বিরুদ্ধে তোলা হয়েছে। অপবিত্র ও কদর্য এবং যারপরনায় পীড়াদায়ক গালি তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এই কাজে সর্বাগ্রে ছিল পাদ্রী সাহেবরা। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

'বস্তুত পাদ্রী সাহেবরা অবজ্ঞা প্রদর্শন ও অবমাননা করতে এবং গালি দিতে সেরা। আমাদের কাছে এমন পাদ্রীদের বই-পুস্তকের ভান্ডার একত্রিত আছে। (নুরুল কুরআন নম্বর২, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২, পৃ: ৩৭৫)

কিতাবুল বারিয়া পুস্তকে তিনি বলেন-

"সেই সময় ব্রিটিশ ভারতে বহু পাদ্রী এমন ছিল যাদের দিবারাত্রি কাজই ছিল আমাদের নবী (সা.) কে গালি দেওয়া। গালি দিতে সব থেকে এগিয়ে ছিল পাদ্রী ইমাদুদ্দীন অমৃতসরী। সে তার রচিত 'তাহকীকুল ঈমান' ও আরও বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশ্যে আঁ হযরত (সা.) কে গালি দিয়েছে।"

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খ--১৩, পৃ: ১২০)

এরপর তিনি (সা.) একাধিক পাদ্রীর নাম নিয়েছেন এবং তাদের রচিত পুস্তকের উল্লেখ করেছেন যেগুলিতে আঁ হযরত (সা.) কে তারা কুৎসিৎ গালি দিয়েছে।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলাম এবং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) -এর উপর হওয়া আপত্তিগুলির কেবল উত্তরই দিয়েছেন বা খৃষ্টান পাদ্রীদের মুখ বন্ধ করেছেন, এমনটি নয়, বরং আঁ হযরত (সা.)কে জীবিত নবী হিসেবে উপস্থাপন করে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণের ধারা অব্যাহত থাকাও প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। একের পর এক প্রতিস্পর্ধা নিয়ে যে প্রতাপশালী ভঙ্গিতে তিনি নিজ প্রভুর আধ্যাত্মিক জীবন প্রমাণ করেছেন তার নজির না অতীতে পাওয়া যেতে পারে না ভবিষ্যতে কোন দিন পাওয়া যাবে। পাদ্রী আব্দুল্লাহ আথমকে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন যে কি না 'আন্দুরানা বাইবেল' নামে নিজের এক পুস্তকে আঁ হযরত (সা.) কে দাজ্জাল নামে আখ্যায়িত করেছিল। যে লেখরাম আঁ হযরত (সা.)কে অবাধে গালি দিত, তার সম্পর্কে তিনি (আ.) মৃত্যর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যা সমহিমায় পূর্ণ হয়েছিল। তার মৃত্যুতে আর্যসমাজীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। আমেরিকার আলেকজান্ডার ডুই, যে আঁ হযরত (সা.) কে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যারচনাকারী মনে করত এবং তাঁকে নোংরা ও অশ্লীল ভাষায় গালি দিত, তার সম্পর্কে তিনি (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমার জীবদ্দশাতেই সে নিজের অপূর্ণ বাসনা নিয়ে লাঞ্ছনাদায়ক মৃত্য বরণ করবে। বস্তুত: এমনটিই হয়েছিল।

একবার এক পাদ্রী আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র সত্তার উপর জঘন্য অপবাদ আরোপ করে। তিনি (আ.) তাকে এমন অনবদ্য ভঙ্গিতে অকাট্য যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিলেন যা তাকে নিরুত্তর করে দিল। এটি এমন উত্তর ছিল যা থেকে আঁ হযরত (সা.)-এর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জানা যায়। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই উত্তরটি পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। বিশেষ করে সেই অংশটুকু যেখানে রোমের বাদশাহ আঁ হযরত (সা.) পা ধুয়ে দেওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন।

গুরুদাসপুর জেলার ফতেহগড় নিবাসী পাদ্রী ফতেহ মসীহ একটি চিঠিতে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে এবং তাঁর সম্পর্কে অনেক কদর্যপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করে। পাদ্রী হযরত আয়েশা সম্পর্কে লেখে, আঁ হযরত (সা.) তাঁর সঙ্গে নয় বছর বয়সে বিবাহ করেন। আর এটিকে পাদ্রী ফতেহ মসীহ ব্যাভিচার আখ্যায়িত করে। এর উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লেখেন:

"প্রথমত, নয় বৎসরের কথা আঁহযরত (সা.)-এর মুখে উল্লেখ হয়েছে এমনটি প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে কোন ওহীও হয় নি বা ঐশী সংবাদ থেকে প্রমাণ হয় না তাঁর বয়স নয় বছরই ছিল। এটি একজন বর্ণনাকারী থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আরবের মানুষ ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা ব্যবহার করত না, কেননা, তারা নিরক্ষর ছিল। তাদের শিক্ষাদীক্ষার নিরীখে বয়সের অনুমানে দুই তিন বছরের পার্থক্য একটি সাধারণ বিষয়। যেমন আমাদের দেশেও অনেক অশিক্ষিত মানুষ দুই-চার বছর বয়সের পার্থক্যকে ঠিক মত মনে রাখতে পারে না। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, বাস্তবে এক একটি দিন হিসেব করে তা নয় বছর হয়েও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন বিবেকবান মানুষ আপত্তি করবে না। কিন্তু নির্বোধদের নিয়ে কি করা যেতে পারে? আমি আপনাদেরকে আমার পুস্তিকায় প্রমাণ করে দেখাব যে, বর্তমান যুগের গবেষক ও চিকিৎসকরা এ কথা স্বীকার করেছেন যে, নয় বছর পর্যন্তও মেয়েরা সাবালিকা হতে পারে। এমনকি সাত বছরেও সন্তানের জন্ম দিতে পারে। বড় বড় গবেষণা করে চিকিৎসকরা একথা প্রমাণ করেছে। আর শত শত মানুষ নিজেরা স্বচক্ষে দর্শন করেছে যে, এই দেশেই আট কিম্বা নয় বছরের মেয়েরা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু আপনার বিষয়ে কোন আক্ষেপ নেই, আর করাও উচিত নয়। কেননা আপনি কেবল বিদ্বেষপরায়ণই নন, বরং নিকৃষ্ট শ্রেণীর নির্বোধও বটে।

পাদ্রী সাহেবের নোংরামি দেখুন। তিনি লিখছেন, আঁ হযরত (সা.) যদি ইংরেজ শাসকের প্রজা হতেন, তবে তাঁর প্রতি কিরূপ আচরণ করা হত? যেন তাঁকে জেলে ঢোকানো হত। নাউযুবিল্লাহ।

আপনি এখনও পর্যন্ত এতটুকুও জানেন না যে, সরকারের আইন প্রজাদের আবেদন অনুসারে তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি অনুসারে রচিত হয়। ... আপনি যে বার বার ইংরেজ সরকারের কথা উল্লেখ করছেন, আমি

এরপর ২২-এর পাতায়.....

‘খাতমে নবুয়ত’-এর অর্থ হল মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর পদমর্যাদা সমস্ত নবীর থেকে শ্রেষ্ঠতর ।

তাঁর সত্যায়ন ও শিক্ষামালার সাক্ষ্য ব্যাতিরেকে কোন ব্যক্তি নবী বা ওলীর মর্যদায় পৌঁছতে পারবে না ।

★ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوۡلٌ ۚ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ئِنۡ مَّاتَ اَوۡ
قُتِلَ انۡقَلَبۡتُمۡ عَلٰۤى اَعۡقَابِكُمۡ ؕ وَمَنۡ يَّنۡقَلِبۡ عَلٰى عَقِبَيۡهِ فَلَنۡ يَّضُرَّ اللّٰهَ
شَيۡـًٔا ؕ وَسَيَجۡزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيۡنَ ○ (آل عمران:145)

এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাহার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই মারা গিয়াছে। অতএব, যে যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহা হইলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইবে? এবং যে ব্যক্তি তাহার গোড়ালিদ্বয়ের উপর ফিরিয়া যাইবে সে আদৌ আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিবেন।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৫)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহুর রাবে (রহ.) বলেন–

“ এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। যেরূপ বলা হয়েছে মুহাম্মদও একজন আল্লাহ্র রসূল আর তিনি রসূল ব্যতীত কিছুই নন। তাঁর পূর্বেকার সমস্ত রসূল মৃত্যু বরণ করেছেন। ‘খালা’ শব্দের প্রয়োগ যখন মূল ক্রিয়াপদ হিসেবে হয়, তখন তার অর্থ পথিকের প্রস্থান করা নয়, বরং প্রস্থান করার অর্থ দাঁড়ায় মৃত্যু বরণ করা। অতএব, ঈসা (আ.) যদি আল্লাহ্র রসূল ছিলেন তবে নিশ্চয় তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ।

(তারজুমাতুল কুরআন, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে, পৃঃ ১০৮)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِكُمۡ وَلٰـكِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

অনুবাদ:মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহে, কিন্তু সে আল্লাহ্র রসূল এবং নবীগণের মোহর ।

(সূরা আহযাব, আয়াত: ৪১)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন:

‘মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন’ শব্দগুলি কুরআন মজীদের । আরবী ব্যকরণ অনুসারে এটি Past Continious পদের অর্থও প্রকাশ করে । পাস্ট কন্টিনিয়াস অনুসারে আমরা এই আয়াতের অর্থ করেছি ‘মহম্মদ (সা.) না কোন পুরুষের পিতা ছিলেন আর না হবেন ।”

নবীদের মোহর সম্পর্কে তিনি বলেন:

অর্থাৎ তাঁর সত্যায়ন ও শিক্ষার সাক্ষ্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নবুয়্যত বা ওলীর মর্যাদা লাভ করতে পারবে না । সাধারণ মানুষ নবীদের মোহরের স্থানে এর অর্থ করেছে শেষ নবী । কিন্তু এতেও আমাদের অবস্থান একই থাকে । আঁ হযরত (সা.) -এর মেরাজকে দৃষ্টিপটে রাখলে নবীদের মর্যাদাক্রম নিম্নরূপ হবে যা মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত হয়েছে ।

এই মানচিত্রটির দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে যে, সৃষ্টির স্থানে যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে সে সর্বপ্রথম হযরত আদমকে দেখতে পাবে এবং সবশেষে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে দেখবে । স্পষ্টতই সে সমস্ত নবীদের শেষ নবী হিসেবে রসুল করীম (সা.)কে আখ্যায়িত করবে । এছাড়াও যদি এই হাদীসটির কথাও যদি ধরা হয় যেখানে বলা হয়েছে যে, আদম তখনও সৃষ্টিও হয় নি, সেই সময়ও আমি খাতামান্নাবীঈন ছিলাম, সেক্ষেত্রেও নবীদের মর্যাদাক্রমের নিক্তিতে রসুল আকরম (সা.) সবার উপরের স্থান লাভ করবেন । তাই মেরাজে আঁ হযরত (সা.) যখন সবার উপরে গেলেন, তখন মহম্মদী মোকাম বা মর্যাদা হল শেষ নবীর মোকাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল । এইরূপে আমার করা অর্থও সঠিক থাকল ।অর্থাৎ ‘খাতমে নবুয়ত’-এর অর্থ হল মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর পদমর্যাদা সমস্ত নবীর থেকে শ্রেষ্ঠতর ।

(তফসীরে সাগীর, পৃঃ ৬৯৫)

★ اَلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَصَدُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ① وَالَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوۡا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الۡحَـقُّ مِنۡ
رَّبِّهِمۡ ۙ كَفَّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ وَاَصۡلَحَ بَالَهُمۡ ② (سورہ محمد:2-3)

অনুবাদ:যাহারা অস্বীকার করে এবং লোকদিগকে আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত রাখে-তিনি তাহাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করিয়া দেন । এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং যাহা মুহাম্মদের উপর নাযেল করা হইয়াছে উহার উপরও ঈমান আনে-বস্তুতঃ ইহা তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে পূর্ণ-সত্য-তিনি তাহাদের অনিষ্টতা সমূহকে দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থান সংশোধন করিয়া দিবেন ।

(সূরা মহম্মদ, আয়াত: ২-৩)

★ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيۡنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡ
تَرٰٮهُمۡ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضۡوَانًا ۖ سِيۡمَاهُمۡ فِىۡ
وُجُوۡهِهِمۡ مِّنۡ اَثَرِ السُّجُوۡدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِى التَّوۡرٰٮةِ ۛۚ وَمَثَلُهُمۡ فِى
الۡاِنۡجِيۡلِ ۛۚ كَزَرۡعٍ اَخۡرَجَ شَطۡـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسۡتَغۡلَظَ فَاسۡتَوٰى عَلٰى سُوۡقِهٖ
يُعۡجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَـغِيۡظَ بِهِمُ الۡكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ مِنۡهُمۡ مَّغۡفِرَةً وَّاَجۡرًا عَظِيۡمًا ○ ۲۹ (الفتح:30)

অনুবাদ: মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল,এবং যাহারা তাহার সঙ্গে আছে, তাহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত। তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সেজদারত দেখিতে পাইবে, তাহারা সর্বদা আল্লাহ্ ফযল ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যত্নবান থাকে। সেজদার চিহ্নের দরুন তাহাদের চেহারায় তাহাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রহিয়াছে। তাহাদের এই বিবরণ তওরাতে আছে, এবং ইঞ্জিলেও আছে তাহাদের বিবরণ, এক শস্য ক্ষেত্রের ন্যায়, যাহা নিজ অঙ্কুর নির্গত করে, অতঃপর উহাকে সুদৃঢ় করে ফলে উহা আরও পুষ্ট হয়, অতঃপর উহা স্বীয় কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা কৃষককে আনন্দিত করে, যেন তিনি তাহাদের (মোমেনদের উন্নতি) দ্বারা কাফেরদিগকে ক্রোধান্বিত করেন। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তা’লা তাহাদের সঙ্গে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন।

(সূরা ফাতাহ, আয়াত: ৩০)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

এই আয়াতে আঁ হযরত (সা.)-এর সে গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলিকে তাঁর সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হয় নি, বরং অব্যবহিত পরেই **‘ওয়াল্লাযিনা মাআহু’** অর্থাৎ তাঁর গুণাবলী তাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে যারা তাঁর সঙ্গে আছেন। গুণগুলির মধ্যে সর্ব প্রথম হল **‘আশিদ্দাও আলাল কুফ্ফার’**। এর অর্থ এই নয় যে, তারা নিজেদের অন্তরের অনমনীয়তার কারণে কাফেরদের উপর কঠোর হবেন, বরং কুফরের প্রভাব গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে তাদেরকে কঠোর বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের অন্তর করুনায় পরিপূর্ণ থাকবে যার কারণে মোমেনরা পরস্পর দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করবে আর তাদের জিহাদের উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জন, জাগতিক সম্পদ লাভ করা নয়। তাই আল্লাহ্ তা’লার সমীপে নতজানু ও সেজদাবনত হয়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করবে অর্থাৎ এমন জাগতিক সম্পদ চাইবেন যার সঙ্গে আল্লাহ্র ভালবাসাও যুক্ত থাকে। এটি তাদের জিহাদের সেই কেন্দ্রবিন্দু যার সম্পর্কে তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর ১৭ পাতায়.....

আঁ হযরত (সা.)-এর অমর বাণী

★ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِیٍٔ مَّا نَوٰی

অনুবাদ: যাবতীয় কর্মের পরিণাম উদ্দেশ্য বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য বা সংকল্প অনুসারে প্রতিদান পায়।

(বুখারী, বাব কায়ফা কানা বাদাআল ওহী ইলা রসুলুল্লাহ্)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى اَجْسَامِكُمْ وَلَا اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের বাহ্যিক দেহ ও চেহারার সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (তাতে কি পরিমাণ নিষ্ঠা ও সৌন্দর্য রয়েছে সেটিই বিচার্য)

★ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ كَالْوِعَاءِ اِذَا طَابَ اَسْفَلُهٗ طَابَ اَعْلَاهُ وَاِذَا فَسَدَ
اَسْفَلُهٗ فَسَدَ اَعْلَاهُ ۔ (ابن ماجہ ابواب الزھد باب التوقی علی العمل)

(মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা)

★ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّاٰتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ
فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَاِنْ هَمَّ
بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَهٗ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ
ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ، وَاِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ
تَعَالٰى عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَاِنْ هَمَّ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً ۔

অনুবাদ: কর্ম হল কোন পাত্রে রাখা বস্তুর ন্যায়। পাত্রে রাখা বস্তুর নিম্নভাগ যদি ভাল হয়, তবে উপরিভাগও ভাল হয়। আর যদি এর নিম্নভাগ নোংরা ও পচা হয়, তবে উপরিভাগও নোংরা ও পচা হয়। (অনুরূপ অবস্থা কর্মেরও)

(ইবনে মাজা, আবওয়াবুয যোহদ)

★ كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَاُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ اَقْطَعُ ۔ وَفِىْ رِوَايَةٍ كُلُّ كَلَامٍ لَا
يُبْدَاُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَجْزَمُ ۔ (ابن ماجہ ابواب النکاح باب خطبۃ النکاح)

অনুবাদ: আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য ও পাপ উভয়টি লিখে রেখেছেন আর প্রত্যেকটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব কোন ব্যক্তি যখন কোন পুণ্য কর্ম সম্পাদন করার সংকল্প করে, কিন্তু সম্পাদন করতে সক্ষম হয় না, তখন সে একটি সম্পূর্ণ পুণ্যের প্রতিদান পায়। আর যদি সে সংকল্প করার পর পুণ্য কর্ম সম্পাদনও করে, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দশ থেকে সাতগুণ পর্যন্ত বরং এর থেকে বেশি পুণ্য তার খাতায় লিখে দেন। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি মন্দ কর্ম করার সংকল্প করে, কিন্তু তা থেকে বিরত থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য সম্পূর্ণ একটি পুণ্য লিখে দেন। তবে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দ কর্ম করে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার একটি মাত্র মন্দ কর্ম বলে গণ্য হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইযা হাম্মাল আবদু বিহাসানাতিন)

★ مَنْ لَّا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللّٰهَ

অনুবাদ: যে ব্যাক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।

(তিরমিযি, বাব মা জাআ ফিশশুকার)

অনুবাদ: প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন ছাড়া আরম্ভ করা হয়, তবে কল্যাণশূন্য ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। অপর এক রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও কথোপকথন (বক্তৃতাদি) যদি খোদা তা'লার প্রশংসাকীর্তন ছাড়া আরম্ভ করা হয় তবে তা কল্যাণশূন্য এবং প্রভাবহীন থাকে।

(ইবনে মাজা, আবওয়াবুন নিকাহ, বাব খুতবাতুন নিকাহ)

★ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اَوْ يُحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ فَلْيَصْدُقْ
حَدِيْثَهٗ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهٗ اِذَا ائْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ
جَاوَرَهٗ ۔ (مشکوۃ باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق بحوالہ بیھقی فی شعب الایمان)

অনুবাদ: আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি যদি সত্যিকারের ভালবাসা থাকে, আর যদি চাও আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তোমাদের ভালবাসুক, তবে এর জন্য তোমাদের করণীয় হল সর্বদা সত্য কথা বলা, যখন তোমাদের কাছে কেউ গচ্ছিত সম্পদ রেখে যায় তা আত্মসাৎ না করা এবং প্রতিবেশীদের প্রতি সব সময় উত্তম আচরণ করা।

(মিশকাত, বাব শাফকাত ওয়াররাহমাতু আলা খুলকে)

★ اَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۔

অনুবাদ: সর্বোত্তম যিকর (আল্লাহ্র স্মরণ) হল 'কালেমায়ে তওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই তার স্বীকারুক্তি দেওয়া এবং সর্বোত্তম দোয়া আলহামদোলিল্লাহ।

(তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব দাওয়াতুল মুসলিম)

★ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُهٗ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ ۔
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ
لَا يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ ۔ (بخاری کتاب الدعوات)

অনুবাদ: যারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে তাদের উপমা জীবিতদের ন্যায় আর যারা আল্লাহকে স্মরণ করে না তাদের উপমা মৃতদের ন্যায়। অর্থাৎ যারা যিকর বা স্মরণ করে তারা জীবিত আর যারা করে না তারা মৃত। মুসলিম-এর রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- সেই গৃহ যেখানে খোদা তা'লার স্মরণ হয় আর সেই গৃহ যেখানে খোদা তা'লার স্মরণ হয় না, তাদের উপমা যথাক্রমে জীবিত ও মৃতদের ন্যায়।

(বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত)

مَنْ كَانَ يُحِبُّ اَنْ يَّعْلَمَ مَنْزِلَتَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللّٰهِ
تَعَالٰى عِنْدَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ اَنْزَلَهٗ مِنْ نَفْسِهٖ ۔

অনুবাদ: যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নিজের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক, সে দেখুক যে নিজে আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দাদের ততটাই মূল্য দেন যতটা তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ সম্পর্কে থাকে।

(কাশীরিয়া, বাব আয যিকর, পৃ: ১১১)

★ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ،
وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَاَمْرٌ
بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ
رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى (مسلم کتاب الصلوۃ باب استحباب صلوۃ الضحٰی)

অনুবাদ: তোমাদের দেহের প্রত্যেকটি অংশ পুণ্য ও সদকায় অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেকটি তসবীহ (আল্লাহ্ তা'লার পত্রিতা ঘোষণা) সদকা, আলহামদোলিল্লাহ উচ্চারণ করা সদকা, মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকা সদকা, এবং 'চাশত' (প্রথম প্রহর)-এর দুই রাকাত নামায পড়া এই সব পুণ্যের সমতুল্য।

(মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাব ইসতেজাবু সালাতুয যোহা)

সমস্ত মান-মর্যাদার চেয়ে অধিক ও উন্নত হচ্ছে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর মান-মর্যাদা, যার প্রভাব সমগ্র ইসলামি বিশ্বের উপর রয়েছে। তাঁর সেই মান-মর্যাদাই পৃথিবীকে পুনর্জীবিত করেছে। আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই নবী দান করেছেন, যিনি খাতামুল মোমেনীন, খাতামুল আরেফীন এবং খাতামুন নাবীঈন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

ফারানের চূড়া থেকে সীরাজে মুনীর (প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের) -এর উদয়

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আল্লাহ্ তা'লা যখন আঁ হযরত (সা.)-এর যুগকে অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত দেখলেন যখন পৃথিবীর আকাশে চুতুর্দিকে পথভ্রষ্টতার কালো মেঘ ছেয়ে ছিল, ঠিক তখনই সেই অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতাকে হেদায়াত এবং সৌভাগ্যে পাল্টে দিতে তাঁর পক্ষ থেকে ফারান পর্বতের চূড়ায় এক প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের উদয় হল অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব ঘটল।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৩)

আঁ হযরত (সা.)-এর অতুলনীয় মর্যাদা

"আমাদের নবী (সা.) সমগ্র জগতের মানুষকে আধ্যত্মিকভাবে উন্নত করার জন্য এসেছিলেন। এই কারণে এই গুণটি তাঁর মধ্যে পরম পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল। এই মর্যাদা সম্পর্কেই কুরআন করীম একাধিক বার সাক্ষ্য প্রদান করেছে আর আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর পাশাপাশি এই ভঙ্গিতেই আঁ হযরত (সা.) -এর গুণাবলী উল্লেখ করেছে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (আম্বিয়া, আয়াত: ১০৮) অনুরূপভাবে বলেছেন- قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا[1] (আল আরাফ, আয়াত: ১৫৯) । কুরআন শরীফের অন্যান্য স্থানগুলি অধ্যয়ন করলে বোঝা যায যে, আঁ হযরত (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা 'উম্মি' (নিরক্ষর) বলে অভিহিত করেছেন। কারণ আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া তাঁর কোন শিক্ষক ছিলেন না, তথাপি তিনি নিরক্ষরই ছিলেন। কুরআন করীম অধ্যয়ন করলে বিস্মিত হতে হয় যে, এই নিরক্ষর ব্যক্তিই আমাদেরকে কেবল গ্রন্থ এবং প্রজ্ঞা শেখাচ্ছেন না, বরং আত্মশুদ্ধির পথ সম্পর্কেও অবহিত করছেন। এমনকি কুরআন মজীদের এই আয়াত اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ-এ বর্ণিত মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছেন। (মুজাদিলা, আয়াত: ২৩) দেখ এবং চিন্তা কর, কুরআন করীম প্রত্যেক প্রকৃতির অন্বেষণকারীকে তাদের অভিপ্সীত গন্তব্যে পৌঁছে দেয় এবং সাধুতা এবং সত্যের প্রত্যেক পিপাসুকে পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ, এই প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রবাহ এবং সত্য ও জ্যোতির প্রস্রবণ কার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? সেই মহম্মদ (সা.)–এর উপরই, একদিকে যাকে নিরক্ষর বলা হচ্ছে, কিন্তু অপরদিকে ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের এমন পরাকাষ্ঠা ও সত্য তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন তুলনা পাওয়া যায় না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)

আঁ হযরত (সা.)-এর চারিত্রিক ও নৈতিক নিদর্শন

"হুযুর (সা.)-এর চারিত্রিক নিদর্শনের মধ্যে এটিও অন্যতম একটি যখন তিনি একটি বৃক্ষের নীচে শায়িত ছিলেন। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ ডাকাডাকি ও চিৎকারে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হলে তিনি দেখলেন, এক আরব বেদুইন তরবারি বের করে তাঁর উপর দাঁড়িয়ে আছে আর বলছে, 'হে মুহাম্মদ! আমাকে বল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?' তিনি (সা.) শান্ত ও দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ। তাঁর একথা সাধারণ মানুষের কথার মত ছিল না। আল্লাহ্' যেটি খোদা তা'লার ব্যক্তিগত নাম এবং সকল পূর্ণ গুণাবলীর নির্যাস, তা আঁ হযরত (সা.)-এর মুখ থেকে এমন আবেগতাড়িত হয়ে নিঃসৃত হল যা সেই বেদুইনের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে ঘা দিল। বলা হয়ে থাকে যে, এটিই সর্বমহান নাম আর এতে বড় বড় কল্যাণ নিহিত আছে। কিন্তু যে ব্যক্তির আল্লাহ্ কথাই স্মরণে নেই এটি তার কোন উপকারে আসবে? মোটকথা এমনভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর মুখ থেকে আল্লাহ্' শব্দ নিঃসৃত হল যে, সেই বেদুইন এর প্রতাপে অভিভূত হয়ে গেল আর তার হাত কাঁপতে আরম্ভ করল। তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল। হুযুর (সা.) সেই তরবারিটিই হাতে তুলে নিয়ে বললেন, এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? দুর্বল হৃদয়ের সেই বেদুইন আর কার নামই বা নিতে পারত? অবশেষে আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং নিজ মহানুভবতা ও মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়ে বললেন, যাও তোমাকে রেহাই দিলাম। আর বললেন, ক্ষমাশীলতা এবং বীরত্ব আমার কাছে শিখে নিও। এই চারিত্রিক নিদর্শন তার উপর এমন অসাধারণ প্রভাব ফেলল যে সে মুসলমান হয়ে গেল।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৬)

সমস্ত মান-মর্যাদার চেয়ে অধিক ও উন্নত হচ্ছে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর মান-মর্যাদা, যার প্রভাব সমগ্র ইসলামি বিশ্বের উপর রয়েছে।

সমস্ত মান-মর্যাদার চেয়ে অধিক ও উন্নত হচ্ছে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর মান-মর্যাদা, যার প্রভাব সমগ্র ইসলামি বিশ্বের উপর রয়েছে। তাঁর সেই মান-মর্যাদাই পৃথিবীকে পুনর্জীবিত করেছে। সেই আরব জাতি যারা ব্যাভিচার, মদ্যপান ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া কিছুই বুঝত না। যাদের মাঝে মানবাধিকারের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল, সহানুভুতি, পরোপকার প্রভৃতি যেখানে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছিল, আর যেখানে কেবল মানবাধিকারই নয়, বরং আল্লাহ্র অধিকার এবং আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য অধিকতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। পাথর, প্রতিমা, বৃক্ষ-লতা ও নক্ষত্ররাজিকে তারা খোদার গুণের শরিক করেছিল। নানান প্রকারের শিরক ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্রই। দুর্বল মানুষের এমনকি মানুষের লজ্জাস্থান বা লিঙ্গেরও পূজা করা হতো। এইরূপ কদর্য অবস্থার চিত্র যদি কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষের সামনে ক্ষণিকের জন্যেও উন্মোচিত হয়, তবে সে এক বিপদসংকুল অন্ধকার অনাচার এবং জুলুমের অতি ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে। পক্ষাঘাত মানুষের একদিককে আক্রমণ করে, কিন্তু এটি এমন পক্ষাঘাত ছিল যা দুটি পার্শ্বকেই আক্রান্ত করেছিল। ফাসাদ বা দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও অনাচার সারা পৃথিবীকেই গ্রাস করে ফেলেছিল। না জলে কোন শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল, না স্থলে। এমন অন্ধকার ও ধ্বংসাত্মক যুগে সে দেশে আমরা দেখেছি রসুল করীম (সা.) আবির্ভাব। তিনি এসে তুলাদণ্ডের দুটি প্রান্তকে সামান্তরাল করে দিলেন। অর্থাৎ হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুল ইবাদকে নিজেদের যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দেখালেন। রসুলে করীম (সা.)-এর নৈতিক শক্তির পরাকাষ্ঠা তখনই উপলব্ধি করা সম্ভব হবে, যখন সেই যুগের পরিস্থিতির উপর নজর দেওয়া হয়। বৈরী ও বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে যেরূপ যাতনা দিয়েছিল, এবং তাদেরই উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের পর তিনি তাদের প্রতি যে আচরণ করলেন, তা থেকেই প্রমাণিত হয় তাঁর (সা.) উন্নত চরিত্রের মহিমা।

আবু জাহল এবং তার সঙ্গীরা এমন কোন্ অত্যাচার বাকি রেখেছিল যা তারা করে নি আঁ হযরত (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ অনুসারীদের উপর? গরীব মুসলমান নারীদেরকে উটের সঙ্গে বেঁধে দুই বিপরীত দিকে উটগুলিকে ছুটিয়ে দেওয়া হত, এবং তাদের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত। তাদের অপরাধ কেবল এতটুকুই ছিল যে, তারা 'লা-ইলাহা ইল্লল্লাহ'-এর উপর ঈমান এনেছিল। কিন্তু তিনি (সা.) এই সব ঘটনা দেখেও ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন। আর যখন মক্কা বিজয় হল, তখন ' লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইওয়ামা' - (তোমাদের

বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নেই আজ) বলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। এ এমন এক চারিত্রিক ঔৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা যা আর অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিওঁয়া আলা আলে মুহাম্মদ।’

খোদা তা’লার অভিপ্রায়, আমরা যেন এই ঔৎকর্ষ ও পরাকাষ্ঠাকে লালন করি

স্মরণ রেখো, পবিত্র গ্রন্থ এবং আঁ হযরত (সা.)-কে প্রেরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা’লার অভিপ্রায় হল পৃথিবীতে আযীমুশশান রহমতের নিদর্শন দেখানো। যেরূপ তিনি বলেছেন-مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ (আম্বিয়া: ১০৮) অনুরূপভাবে কুরআন মজীদ প্রেরণের উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে- ‘হুদাল্লিল মুত্তাকিন’ (বাকারা: ৩) এটি এমন মহান উদ্দেশ্য যার তুলনা পাওয়া যায় না। এই কারণেই আল্লাহ্ তা’লা চান যে, যেভাবে বিভিন্ন গুণের ঔৎকর্ষ যা ভিন্ন ভিন্ন নবীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল সেগুলি সবই আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তায় সমাবিষ্ট করা হোক আর বিভিন্ন গ্রন্থের যে সকল বৈশিষ্ট ও উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা ছিল তা কুরআন শরীফে একত্রিত করা হোক। অনুরূপভাবে সকল জাতির মধ্যে যে উৎকর্ষ ছিল তা এই জাতিতে একত্রিত করে দেওয়া হোক। তাই খোদা তা’লার অভিপ্রায় এই উৎকর্ষকে আমরা যেন লালন করি আর একথাও আমাদের ভুললে চলবে না যে, ঔৎকর্ষের যে পরম মার্গে তিনি আমাদেরকে পৌঁছে দিতে চান, সেই অনুসারে আমাদেরকে তিনি শক্তি সামর্থও দান করেছেন। কেননা, সেইরূপ শক্তিবৃত্তি না দেওয়া হলে আমরা সেই ঔৎকর্ষ কোনওভাবেই লাভ করতে পারতাম না। ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১০)

আঁ হযরত (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈন-এর মর্যাদা

“ আমাদেরকে আল্লাহ্ তা’লা সেই নবী দান করেছেন, যিনি খাতামুল মোমেনীন, খাতামুল আরেফীন এবং খাতামুন নাবীঈন। অনুরূপ তিনি তাঁর উপর সেই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও খাতামাল কুতুব। রসুলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান্নাবীঈন যাঁর উপর নবুয়ত সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই নবুয়ত সেইভাবে সমাপ্ত হয় নি, যেভাবে কেউ কণ্ঠরোধ করে কাউকে হত্যা করে। এমন সমাপ্তি গর্ব করার মত নয়, বরং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর নবুয়ত সমাপ্ত হওয়ার অর্থ হল স্বভাবিকভাবে তাঁর উপর নবুয়তের পরাকাষ্ঠা সমাপ্ত হল। অর্থাৎ আদম থেকে আরম্ভ করে মসীহ ইবনে মরিয়ম পর্যন্ত এই সকল নবীদেরকে যে সকল গুণাবলীর উৎকর্ষতা দেওয়া হয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট প্রদান করা হয়েছিল, সেগুলি সমস্তই আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তায় এসে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এইভাবে তিনি স্বাভাবিক অর্থে খাতামান্নাবীঈন বলে গণ্য হন। অনুরূপভাবে সেই সকল পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষা, উপদেশাবলী ও তত্ত্বজ্ঞান যা বিভিন্ন গ্রন্থে ছিল সেগুলি কুরআন শরীফে এসে বিলীন হয়ে গেছে আর এইভাবে কুরআন শরীফ খাতামুল কুতুব বলে গণ্য হল। ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১১)

আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির নিরিখে রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে খাতামান্নাবঈন বলে বিশ্বাস করি।

এই স্থানে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার এবং আমার জামাতের উপর যে অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, আমরা রসুলুল্লাহ (সা.) কে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি না, এটি এক বিরাট অপবাদ। আমরা যে দৃঢ় বিশ্বাস, তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে আঁ হযরত (সা.) কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে মান্য করি তার লক্ষভাগের এক ভাগও তারা মানে না। খাতমে নবুয়তের মধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব ও তাৎপর্য নিহিত আছে তা উপলব্ধি করার যোগ্যতাই এদের নেই। তারা কেবল নিজেদের পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে একটি কথা শুনে রেখেছে, কিন্তু তার তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা জানেই না যে খতমে নবুয়ত কি জিনিস আর এর উপর ঈমান আনার অর্থৎ কি? কিন্তু আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে (যা আল্লাহ্ তা’লা সর্বোত্তম জানেন) আঁ হযরত (সা.) কে খাতামুল আম্বিয়া বলে বিশ্বাস করি। খোদা তা’লা আমার উপর খাতমে নবুয়তের সত্যতা এমনভাবে উন্মোচিত করেছেন যে, এই জ্ঞানের উৎস থেকে যে পানীয় আমাকে পান করানো হয়েছে তা বিশেষ স্বাদের। যারা এই প্রস্রবণ থেকে পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছে, তারা ভিন্ন কেউ এর স্বাদ সম্পর্কে অনুমান করতে পারে না।”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১২)

আঁ হযরত (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ কর। এক বিন্দু পরিমাণও এর থেকে বিচ্যুত হওয়ার চেষ্টা করো না।

আমি একথাও জানি যে, অনেকে নিজেদের স্বরচিত উপাসনা পদ্ধতি এবং দোয়ার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার সেই পরম মার্গ অর্জন করতে চায়, কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, যে পন্থা আঁ হযরত (সা.) অবলম্বন করেন নি, সেটি নিতান্তই বাজে। যে পথে চলে আল্লাহ্র পুরস্কার অর্জিত হয়েছে সেই পথের পথিকদের মধ্যে আঁ হযরত (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কি কেউ হতে পারে? যাঁর উপর নবুয়তেরও সকল ঔৎকর্ষ পূর্ণ হয়েছে। তিনি যে পথ অবলম্বন করেছেন সেটি সব থেকে সঠিক এবং সর্বোত্তম। সেই পথ ত্যাগ করে নতুন পথ প্রবর্তন করা, বাহ্যতঃ তা যতই আকর্ষনীয় মনে হোক না কেন, আমার মতে সেটি ধ্বংসের পথ আর খোদা আমার কাছে এমনটিই প্রকাশ করেছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর প্রকৃত অনুবর্তিতায় খোদাকে পাওয়া যায়। তাঁর অনুবর্তিতা ত্যাগ করে কেউ যদি আজীবন ঠোকর (সিজদা) মারতে থাকে, তবুও সে প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

আঁ হযরত (সা.)-এর পথ ত্যাগ করো না। আমি দেখছি লোকেরা নানান প্রকারের ইবাদত পদ্ধতি ও দোয়ার প্রবর্তন করেছে। উল্টো হয়ে নানান কায়দায় ঝুলে থাকে আর সন্ন্যাসী ও সংসারত্যাগীদের পথ অবলম্বন করা হচ্ছে। কিন্তু এসব বৃথা কাজ। এভাবে উল্টো পাল্টা ভঙ্গি করে ঝুলে থাকা বা নেতিবাচক কাজের উল্লেখ করা নবীদের রীতি নয়। আঁ হযরত (সা.)কে আল্লাহ্ তা’লা এই কারণেই উৎকৃষ্টতম আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। **‘লাকাদ কানা লাকুম ফি রসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা’**। (আহযাব: ২২) তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর এবং এর থেকে বিন্দুমাত্র পরিমাণও বিচ্যুত হওয়ার চেষ্টা করো না।

তিনি (সা.) সাহবাদের সেই পবিত্র জামাত প্রস্তুত করেছেন যে কারণে তাদের বলা হয়েছে

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

আল্লাহ্ তা’লা বলেন- فَاسۡتَقِمۡ کَمَاۤ اُمِرۡتَ ‘ফাসতাকিম কামা উমেরতা’ । (হুদ, আযাত: ১১৩) অর্থাৎ সোজা হয়ে যাও। কোন প্রকারের অপকর্মের বক্রতা যেন না থাকে, তবেই আমি সন্তুষ্ট হব। নিজেও সোজা হও আর অন্যদেরকেও সোজ কর। আরবদের জন্য সোজা করা কত কঠিন কাজ ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) মানুষের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমাকে সূরা হুদ বুড়ো করে দিয়েছে। কেননা, এই আদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক গুরু দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। নিজেকে সোজা করা এবং আল্লাহ্ তা’লার আদেশাবলী মেনে চলা যখন মানুষের নিজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তখন তা পালন করারও সম্ভব। কিন্তু অপরকে তদনুরূপভাবে গড়ে তোলা মোটেই সহজ কাজ নয়। এর থেকে আমাদের নবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি (সা.) এই আদেশ কিভাবে পালন করলেন? তিনি (সা.) সাহাবাদের এমন এক জামাত তৈরী করলেন যাদেরকে ‘কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরেজাত লিন্নাস’ বলা হল। (আলে ইমরান: আয়াত-১১১) ‘রাজিআল্লাহ্ আনহু ওয়া রাজু আনহু’ তাদের জন্য বলা হল। (সূরা বাইয়েনাহ, আয়াত: ৯) তাঁর জীবনের কোন মুনাফিক মদীনায় ছিল না। মোটকথা তিনি এমন সফলতা অর্জন করেছিলেন যার তুলনা অন্য কোনও নবীর জীবনী থেকে পাওয়া যায় না। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৬)

“আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, আঁ হযরত (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে যে ব্যুৎপত্তি অর্জন হয়েছে তা কেবলই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে।”

আমরা যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রসুল প্রেম সম্পর্কে অসংখ্য লেখনীর উপর দৃষ্টি দিই, যেমন তাঁর আরবী, ফার্সি এবং উর্দুতে রচিত বিভিন্ন পুস্তক, উক্তি ও পদ্য রচনা অধ্যয়ন করি তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালবাসার উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত কেউ পৌঁছাতেই পারে না।

কাসিদা রূপে তাঁর আরবী ভাষাতেও রচনা রয়েছে যা পড়ে আরবরাও অভিভুত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর প্রশংসায় ভালবাসা মাখা এমন বাণী আমরা পূর্বে না কখনও শুনেছি, না পড়েছি।

আমরা মুসলমান, নাকি মুসলমান নই- এর জন্য কোন সরকার, ধর্মীয় আলেম বা নামধারী আলেমের কাছে থেকে সনদ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিম্বা কোন ফর্মে লিখে দিলেই আমরা মুসলিম বা অমুসলিম হয়ে যায় না। আমাদের কেবল একটিই সনদ প্রয়োজন আর সেটি হল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আল্লাহ্ যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন আর তখনই আমাদেরকে এই সনদ দিবেন যখন প্রকৃত অর্থে হযরত মহম্মদ (সা.)-এর উম্মত হয়ে উঠব এবং তাঁর অনুবর্তিতা অবলম্বনকারী হব।

এখন এই বছরটিও শেষ হচ্ছে । কিছু দেশে চব্বিশ ঘন্টা আর কিছু দেশে দুই দিন ও দুই রাত অবশিষ্ট আছে । বছরের শেষের এই দিনগুলিও দরুদে পরিপূর্ণ করে রাখুন আর নতুন বছরকেও দরুদ সালাম দিয়ে স্বাগত জানান যাতে আমরা যথাশীঘ্র এই সকল কল্যাণরাজি অর্জনকারী হই যা আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ।

হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রাণদাস ইমামুয যামান হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে মহানবী (সা.) -এর সত্যতা, সুমহান মর্যাদা এবং আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা

দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যম আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কল্যাণরাশি লাভ করার প্রতি আহ্বান ।

জলসা সালনা কাদিয়ান ২০১৮ উপলক্ষ্যে, ৩০ শে ডিসেম্বর বায়তুল ফুতুহ লন্ডন থেকে হুযুর আনোয়ার কতৃক প্রদত্ত সমাপনী ভাষণ যা সরাসরি এম.টি.এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

আজ এবছর জলসা সালানা কাদিয়ানের শেষ দিনের শেষ অধিবেশন। এই মূহুর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রায় আঠারো -উনিশ হাজার আহমদী সেই জনপদে একত্রিত হয়েছেন যেটি যুগের ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর বাসস্থল। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী যিনি আঁ হযরত (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী ও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর আনীত ধর্মের সংস্কারের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি যেখানে ইসলামের অভূতপূর্ব শিক্ষা অনুসারে মানুষকে খোদার নিকটে নিয়ে আসার পথ দেখিয়েছেন আর কুরআন করীমের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীর সামনে স্পষ্ট করেছেন, তেমনি অপরদিকে আঁ হযরত (সা.)এর সম্মান ও মহান মর্যাদা সম্পর্কে পৃথিবীকে অবগত করে পুণ্যবান ও ইসলামের উপর বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা মুসলমানদের ঈমানকে দৃঢ়তা দান করেছেন, শুধু তাই নয়, বরং প্রত্যেক ইসলাম বিরোধী এবং আঁ হযরত (সা.)-এর নিন্দুকদের নিরুত্তর করেছেন আর ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদেরকে যুক্তিপ্রমাণে পরিপূর্ণ আক্রমণে এমনই দিশেহারা করে দিয়েছেন যে, রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া তাদের কোন পথ ছিল না। তাঁর রসুল প্রেমের সেই মর্যাদা ছিল যে পর্যন্ত না কেউ পৌঁছেছে আর না কেউ পৌঁছতে পারবে। এই প্রেমের অবস্থা এবং আল্লাহ্ তা'লার তাঁর প্রতি আচরণ ও পুরস্কারের বর্ষণের কথা উল্লেখ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন-

“এক রাত্রিতে এই অধম এত অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়ল যে মন ও প্রাণ সুরভিত হয়ে উঠল । সেই রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখলাম যে (ফিরিস্তিরা) শুদ্ধ ও শীতল পানীয় রূপে জ্যোতিতে পরিপূর্ণ মশক (চামড়ার থলে) এই অধমের গৃহে বয়ে নিয়ে আসছে । এবং তাদের মধ্যে একজন বলল এগুলি ঐসকল বরকত যা তুমি মহম্মদ (সাঃ) এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে ।” পুনরায় তিনি বলেন, “একদা ইলহাম হল যার অর্থ এই ছিল যে ফিরিস্তাদের স্থানে (দেবালয়ে) বাগ বিতন্ডা চলছে । অর্থাৎ ধর্মের পুনর্জীবনের জন্য ঐশী ইচ্ছা উদ্বেলিত হচ্ছে ।” (ধর্মকে নতুন রূপে জীবিত করার জন্য) “কিন্তু এখনও ফিরিস্তাদের নিকট (দেবালয়ে) নব জীবন দানকারীর নিযুক্তি উন্মোচিত হয়নি । (যে ব্যক্তি ধর্মকে জীবিত করবে তার পরিচয় অজ্ঞাত আছে) “এই জন্য তারা দ্বিধা বিভক্ত । এরই মধ্যে স্বপ্নে দেখি যে লোকেরা এক নব জীবন দানকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে । তারপর এক ব্যক্তি এই অধমের সম্মুখে উপস্থিত হল এবং ইঙ্গিত করে বলল ‘হাযার রাজুলু ইউহেব্বুর রাসূল’ অর্থাৎ ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি রসুলুল্লাহ(সাঃ) কে ভালবাসেন । এই কথার অর্থ এই ছিল যে , এই পদের জন্য সবচাইতে বড় শর্ত হল রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভালবাসা । অতএব, তা এই ব্যক্তির মধ্যে প্রমাণিত ।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড-পৃ: ৫৯৮-এর পাদটীকা)

তিনি (আ.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা রসুলে করীম (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার কারণে আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন । তাঁর এই কথা শুনে আঁ হযরত (সা.)-এর এমন একনিষ্ঠ প্রেমিক এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রেরিত এই পুরুষকে সাধারণ মুসলমান ও বিশেষ করে উলেমা সম্প্রদায়ের উচিত ছিল তাঁর সঙ্গ দেওয়া। কিন্তু উলেমারা বা বলা উচিত যে,

নামধারী উলেমারা নিজেদের অন্তরের অনমনীয়তা, অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের কারণে তাঁর উপর এই অভিযোগ আরোপ করতে আরম্ভ করে যে, নাউযুবিল্লাহ, তিনি (আ.) আঁ হযরত (সা.) এর মর্যাদাকে খাটো করেছেন। অতএব তিনি কাফের আর তাঁর মান্যকারীরাও কাফের। তারা এই অভিযোগ আজও আরোপ করে চলেছে। কিন্তু এর বিপরীতে আমরা যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রসুল প্রেম সম্পর্কে অসংখ্য লেখনীর উপর দৃষ্টি দিই, যেমন তাঁর আরবী, ফার্সি এবং উর্দুতে রচিত বিভিন্ন পুস্তক, উক্তি ও পদ্য রচনা অধ্যয়ন করি তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালবাসার উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত কেউ পৌঁছাতেই পারে না। তাঁর প্রতিটি শব্দ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ভালবাসায় বিলীন হওয়ার প্রমাণ দেয়। একথা যখন পুণ্যবান উলেমা (উলেমাদের মধ্যেও অনেকে পুণ্যবান রয়েছেন, আর তারা বিভিন্ন দেশে রয়েছেন) এবং সাধারণ মুসলমানদের কাছে প্রকাশ পায়, তখন তারা তাঁর বয়আত করে দাসত্ব বরণ করে নেয়। আর এইভাবে প্রকৃত প্রস্তাবে আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বকেই বরণ করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর এক ফার্সি পঙক্তিতে বলেন-

'বাআদ খোদা বা ইশকে মুহাম্মদ মুখার্‌রম' গর কুফর ইঁ বাওয়াদ বাখুদা সখত কাফেরম।'

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৫)

অর্থাৎ আমি তো খোদা তা'লার ভালবাসার পর মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেমে বিভোর হয়ে আছি। যদি খোদা তা'লা ও তাঁর রসুলের প্রতি এই প্রেম কুফর' হয়ে থাকে, তবে খোদার কসম আমি সব থেকে বড় কাফের। অনুরূপভাবে কাসিদা রূপে তাঁর আরবী ভাষাতেও রচনা রয়েছে যা পড়ে আরবরাও অভিভুত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর প্রশংসায় ভালবাসা মাখা এমন বাণী আমরা পূর্বে না কখনও শুনেছি, না পড়েছি। আল্লাহ্ করুক পৃথিবীর মুসলমানেরা এই প্রকৃত রসুল প্রেমিকে সনাক্ত করুক আর মুসলমানেরা সংকোচের কারণে বা উলেমাদের ভয়ে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরিত এই রসুল প্রেমিকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ্ তা'লার বিরাগভাজন না হয়ে বসে।

অসৎ প্রকৃতির আলেমদের সম্পর্কে একটি কৌতুক মনে পড়ে গেল। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় এক মৌলানা আহমদীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছিলেন আর কুফরের ফতোয়া দিচ্ছিলেন। তিনি নিজের অজ্ঞতার কারণে অথবা কথার ফাঁকে একথা বলে ফেলেন, তিনি পূর্বেও একাধিকবার বলেছেন অমুক মৌলানা আমাদের বড় মৌলবী আর তিনি অসৎ প্রকৃতির মৌলবীদের মধ্যে পড়েন, তিনিও এই ফতোয়া দিয়েছেন যে এরা (আহমদীরা) কাফের। যাইহোক তাঁকে ধন্যবাদ। আমরা তো আগে থেকেই বলছি কোন নিকৃষ্ট আলেমই এমন ফতোয়া দিতে পারে, কোন প্রকৃত আলেম এমন ফতোয়া দিতে পারে না। যাইহোক, এরা বলুক বা না বলুক, আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত পুরুষের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে এরা নিকৃষ্ট আলেমদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখন আমি এই রসুল প্রেমির ভালবাসায় বর্ণনা করা কিছু কথা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশকারী কিছু লেখনী উপস্থাপন করব যার প্রত্যেকটি শব্দ আহমদী এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে কাফের নামে অপবাদ দানকারীদের গালে চপটাঘাতের সমান।

সমস্ত নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ নবী এবং পৃথিবীর সর্বমহান প্রশিক্ষক আঁ হযরত (সা.)। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" সকল নবী থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার আসল বিশেষত্ব এই যে, তিনি (সা.) হলেন পৃথিবীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা- 'মুরুব্বীয়ে আজম'। তাঁর হাতেই পৃথিবীর সর্বগ্রাসী দুর্নীতিপরায়ণতা -ফাসাদে আজম' দূরীভূত হয়েছে। তিনিই হারানো তওহীদ পুনরুদ্ধার করেছেন এবং পুনরায় তা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনিই সমস্ত বিপথগামীদের সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করেছেন। তিনিই সমস্ত বাতিল ধর্মকে দলীল-প্রমাণের দ্বারা পরাভূত করেছেন। তিনিই প্রত্যেক নাস্তিক ও সংশয়বাদীর অপচিন্তা বিদূরিত করেছেন। তিনিই নাজাত বা পরিত্রাণের প্রকৃত পন্থা দর্শন করেছেন। তিনিই পরিত্রানের নীতি-দর্শন শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব, এর থেকেই প্রমাণিত যে, তাঁর কল্যাণ, তাঁর আশিস ও মঙ্গলময়তা এক্ষেত্রে সবাইকে অতিক্রম করে গেছে। এবং তাঁর মর্যাদা ও তাঁর স্তর সকলেরই উর্ধ্বে। ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে, আসমানী গ্রন্থসমূহ সাক্ষ্যদান করছে এবং যার চোখ আছে সে স্বয়ং দেখতে পাচ্ছে, সেই নবী যিনি এ সমস্ত বিষয়েই সকল নবীগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, দ্বিতীয়ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৭)

অতঃপর আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যতা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল সেই যামানাতে যখন সারা পৃথিবীতেই শিরক বা অংশীবাদিতা এবং বিপথগামিতা, গোমরাহী এবং সৃষ্টির পূজা বিস্তার লাভ করেছিল, এবং সমস্ত লোক সত্য ধর্মমত পরিত্যাগ করেছিল। সিরাতুল মুস্তাকিমকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিল। প্রত্যেক সম্প্দ্রায়ই তার নিজস্ব বেদাত-এর পথ অনুসরণ করছিল। আরবদের সর্বত্র মূর্তি-পূজা দারুনভাবে বেড়ে গিয়েছিল। পারস্যে অগ্নি-পূজা ছেয়ে গিয়েছিল। হিন্দুস্তানে মূর্তি -পূজা ছাড়াও শত শত প্রকারের সৃষ্টি-পূজা বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে কিছু সংখ্যক পুরাণ ও পুস্তক রচিত হয়েছিল, যেগুলির মাধ্যমে খোদার বহু বান্দাকে খোদা বানানো হয়েছিল, এবং অবতার-পূজার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। পাদ্রী বোর্ট সাহেব" সম্ভবত এখানে ছাপার ভুল রয়েছে। আসল নাম হল জন ডেভনপোর্ট।' এবং আরও কতিপয় ইংরেজ লেখকের কথা মতে, খৃষ্টান ধর্ম সে সময়ে এত বেশি কলুষিত হয়েছিল যে, অপর কোন ধর্মই তেমন কলূষিত হয় নি। এবং পাদ্রী ও যাজকদের অসৎ চরিত্র ও ভ্রান্ত মতের কারণে তখন খৃষ্টান ধর্ম নিতান্ত অমর্যাদাকর অবস্থায় পতিত হয়েছিল। এবং খৃষ্টান ধর্মমতে মাত্র দু' একজন নয়, বহু লোককে খোদার আসনে বসানো হয়েছিল। অতএব, আঁ হযরত (সা.) এমন এক সার্বজনীন গোমরাহী বা বিপথগামিতার যামানায় আবির্ভুত হয়েছিলেন, যখন স্বয়ং সমসাময়িক অবস্থার চাহিদা এটাই ছিল যে, একজন উন্নত মর্যাদার (আধ্যাত্মিক) চিকিৎসক ও সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটুক। কেননা, তখন একান্ত প্রয়োজন ছিল ঐশী হেদায়াতের। সেই সময়েই আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে তৌহিদ ও সৎকর্মের আলোকে আলোকিত করা এবং শিরক ও সৃষ্টি-পূজা, যা কিনা যাবতীয় অপকর্মের জননী, তার মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করা, এই সত্য প্রমাণিত করার পক্ষে এক সাফ দলীল যে, আঁ হযরত (সা.) খোদা তা'লার সত্য রসুল ছিলেন এবং সমস্ত রসূলের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

(বারাহীনে আহমদীয়া, দ্বিতীয়ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১২-১১৩)

একদিকে তিনি (সা.) তওহীদ ও পুণ্যকর্মকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর অপরদিকে যে সৃষ্টি-পূজা এবং শিরক কে নির্মূল করলেন। তিনি বলেছেন, এই জিনিসগুলি যাবতীয় প্রকারের অপকর্মের জননী। স্বয়ং পাদ্র সাহেব একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের সেই যুগে এই শিরক এমনভাবে প্রসার লাভ করেছিল।

আঁ হযরত (সা.) সব থেকে বেশি আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতি অর্জনকারী ছিলেন আর এক্ষেত্রে তিনি সকল নবীগণের থেকে পূর্ণতম ছিলেন। এবিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"যেহেতু, আঁ হযরত (সা.) বাতেনী পবিত্রতায়, হৃদয়ের প্রসারতায়, নিষ্পাপ হওয়ায়, নম্রতায়, সততায়, বিশ্বস্ততায়, এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতায়, কৃতজ্ঞতায় এবং ভালবাসায়, প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই সকল নবীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং উন্নত এবং পরিপূর্ণ ও উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ ছিলেন; সেহেতু আল্লাহ্ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাঁকে (সা.) বিশেষ উৎকর্ষতার আতর দিয়ে সবার চাইতে বেশি করে অভিষিক্ত করেছেন।" সেই সকল উৎকর্ষ যা একজন মানুষের মধ্যে থাকা সম্ভব ছিল, সেগুলির দ্বারা সব থেকে বেশি আঁ হযরত (সা.)-কে সুরভিত করা হয়েছে। " এবং সেই বক্ষ ও হৃদয়, যা সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বক্ষ ও হৃদয় থেকে অধিক প্রসারিত এবং পবিত্র এবং নিষ্পাপ এবং আলোকিত এবং প্রেমিক ছিল, তাকে এরূপ উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত করা হলো যে, তার উপরে এমন ওহী নাযিল বা ঐশী বাণী অবতীর্ণ হল যা সকল পূর্ববর্তীগণের ওহী থেকে অধিকতর শক্তিশালী এবং পূর্ণ এবং উন্নত এবং উত্তম। এবং এই কারণেই তা ঐশী গুণাবলী প্রদর্শনের নিমিত্তে এক স্বচ্ছ-সুনির্মল এবং প্রশস্ত ও বৃহদাকার আয়না হয়ে গেল।" এমন ওহী অবতীর্ণ হল যা পরম উৎকর্ষে

উপনীত ছিল এবং পূর্ণতম ছিল, যাতে ঐশী গুণাবলী তার দ্বারা প্রদর্শিত হয়। এটি ছিল দেখানোর জন্য একটি আয়না স্বরূপ। তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর তা প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, "এটাই সেই কারণ, যে জন্য কুরআন শরীফে যে কামালাত বা পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা বিদ্যমান তার সামনে পূর্ববর্তী কেতাবগুলির দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কোন মন এমন কোন সত্যতাকে তুলে ধরতে পারবে না, যা এর মধ্যে পূর্ব থেকেই বিবৃত হয় নি। কোনও যুক্তি এমন কোন তর্ক উপস্থাপন করতে পারবে না, যা পূর্ব থেকেই এর মধ্যে উপস্থাপন করা হয় নি।" অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)এর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রত্যেকটিই কুরআন করীমে বিদ্যমান। "কোন বক্তৃতা কোন হৃদয়ের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না, যেমন শক্তিশালী ও বরকতময় প্রভাব লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের উপর বিস্তার করে আসছে এই কিতাব।" যারা কুরআন করীম অনুধাবন করার চেষ্টা করে। "এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার পূর্ণ ও পারফেক্ট গুণাবলীর এক অতীব স্বচ্ছ ও সুনির্মল আয়না যার মাধ্যমে সেই সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়, যা একজন সত্যান্বেষীকে মারেফাতের অতি উচ্চ স্তর সমূহে উপনীত করার জন্য প্রয়োজন।"

(সুরমা চশম আরিয়া, রুহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭১-৭২)

অতএব এই হল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি। এই শিক্ষার বাইরে কিছুই নেই। তবে কেউ কিভাবে এই অভিযোগ আরোপ করতে পারে যে, নাউযুবিল্লাহ্, তিনি আঁ হযরত (সা.) এবং কুরআন করীমের মর্যাদা খাটো করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার মারেফাত কেবল আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। এটি লাভ করা সম্ভব একমাত্র তাঁর উপর অবর্তীণ শরিয়ত বিধান অনুধাবনের মাধ্যমেই।

আঁ হযরত (সা.)-এর যে পবিত্রকরণ শক্তি ছিল, যা সাহাবাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল, সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

"একথা নিশ্চয় কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে গোপন নয় যে, আঁ হযরত (সা.)-এর জন্মভূমি হল একটি উপদ্বীপের ন্যায় দেশ যেটি আরব নামে পরিচিত। এই দেশটি চিরকালই পৃথিবীর অন্যন্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে। আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে পশুর ন্যায় জীবনযাপন করা, ধর্ম-ঈমান-মানবাধিকার সম্পর্কে উদাসীন থাকা, শত শত বছর ধরে পৌত্তলিকতা এবং অন্যান্য অপবিত্র মতবাদে নিমজ্জিত থাকা, আমোদ-প্রমোদ ও উদ্দাম বিনোদন, মদ্যপান, জুয়া প্রভৃতি অনাচারে চরমভাবে অধঃপতিত হওয়া, চুরি, দস্যুবৃত্তি, হত্যা, শিশুকন্যা হত্যা, অনাথদের সম্পদ আত্মসাৎ করা অপরের সম্পদ ভক্ষণ করাকে বৈধ মনে করা- মোট কথা যাবতীয় প্রকারের অন্যায় ও অত্যাচার, উদাসীনতা সমগ্র আরবে এমন এক সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যে কুখ্যাত ইতিহাস সম্পর্কে একজন বিদ্বেষপরায়ণ বিরুদ্ধবাদীও অস্বীকার করতে পারবে না, যদি সে এ বিষয়ে জ্ঞান রাখে। আর প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কাছে এটি স্পষ্ট যে, সেই অজ্ঞ, পশুতুল্য ও অপবিত্র মানুষগুলির মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করে কুরআন করীম গ্রহণ করার পর কি অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটল আর কিভাবে ঐশী বাণীর প্রভাব এবং নবী করীম (সা.)-এর সাহচর্যের কল্যাণ স্বল্প দিনের মধ্যেই তাদের অন্তরসমূহকে সহসা এমনভাবে বদলে দিল যে, তারা অজ্ঞতার পরিবর্তে ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল আর জগতের ভালবাসা ত্যাগ করে ঐশী ভালবাসায় এমন আত্মহারা হয়ে উঠল যে, নিজেদের জন্মভূমি, সম্পদ, আত্মীয় স্বজন, সম্মান, প্রাণ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিসর্জন দিল। ..... সেটি কোন জিনিস ছিল যা তাদেরকে এত শীঘ্র এক জগত থেকে অপর এক জগতের দিকে টেনে নিয়ে গেল? সেটি দুটি বিষয় ছিল। এক, এই পবিত্র নবী নিজের পবিত্রকরণ শক্তিতে অত্যন্ত বলীয়ান ছিলেন, এতটাই যে, না কখনও এমনটি হয়েছে না হবে। দ্বিতীয়, মহাশক্তিশালী, জীবন্ত-জীবনদাতা ও চিরস্থায়-স্থিতিদাতা খোদার পবিত্র বাণীর শক্তিশালী ও বিচিত্র প্রভাব যা এক জাতিকে হাজার হাজার অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিয়ে নিয়ে এসেছে। কুরআনের এই প্রভাব যে অলৌকিক নিদর্শন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা পৃথিবীতে নিদর্শন হিসেবে কেউ বলতে পারে না যে, কখনও কোন কিতাব এমন প্রভাব ফেলেছে। কে আছে যে এর প্রমাণ দিতে পারে যে, কোন কিতাব এমন বিচিত্র পরিবর্তন ও সংশোধন করেছে যেমনটি কুরআন শরীফ করেছে।

(সুরমা চশমা আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৬-৭৮)

যে জ্যোতি আঁ হযরত (সা.) লাভ করেছিলেন তা অন্য কেউ লাভ করেন নি। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"সেই যে সর্বোচ্চ স্তরের 'নূর' (আলো) যা মানবকে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ পূর্ণ-মানবকে, যা ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না, যা পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে ছিল না, নদী সমূহের ছিল না, ছিল না মুক্তো মানিক্যে, পান্নাতে আর মোতিতেও, তা ছিল কেবল মানবের মধ্যে অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে, যার শ্রেষ্ঠতম এবং পূর্ণতম, সর্বোত্তম এবং সুন্দরতম অস্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও প্রভু, নবীগণের নেতা অমর জীবনপ্রাপ্তগণের নেতা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। অতএব, সেই নূর দান করা হয়েছে সেই মানবকেই, এবং মর্যাদা অনুপাতে তাঁর রঙে রঙিন সেই সকল মানুষকেও যারা নিজেদের মধ্যে কিছু না কিছু সেই রঙ রাখে। এবং এই মর্যাদা সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তমরূপে পাওয়া যায় আমাদের নেতা আমাদের প্রভু আমাদের হাদী, নবীয়ে উম্মী, সাদেকে মসদুক (সত্য ও সত্যতায় পরীক্ষিত) মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে। কুরআন করীমে স্বয়ং খোদা তা'লা বলেন-

-قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ
بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ۔ (الانعام:163-164) وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ
مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ (الانعام:154)
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ۔ وَ اللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (آل عمران:32) فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ (آل عمران:21) وَ اُمِرْتُ
اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (المؤمن:67)"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "এই আয়াতে সেই সব নির্বোধ একেশ্বরবাদীদের মতবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে যাদের বিশ্বাস, আমাদের নবী (সা.)-এর অন্যান্য সকল নবীর উপর সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত নয়।" অর্থাৎ তিনি অন্যান্য নবীদের উপর সম্পূর্ণভাবে শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন, একথা প্রমাণিত হয় না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সেই সব নির্বোধ একেশ্বরবাদীদের মতবাদের এখানে খণ্ডন করা হচ্ছে যারা বলে, অন্যান্য নবীদের উপর সম্পূর্ণভাবে শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন, একথা প্রমাণিত হয় না। তারা দুর্বল হাদীস উপস্থাপন করে বলে, আঁ হযরত (সা.) নিজেকে ইউনুস বিন মাত্তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। এই নির্বোধেরা একথা বোঝে না যে, সেই হাদীসটি সঠিক হলেও, সেটি ছিল বিনয় প্রদর্শন করতে গিয়ে, যা আঁ হযরত (সা.)-এর অভ্যাস ছিল। প্রত্যেক কথা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যদি কোন পুণ্যবান ব্যক্তি পত্রে নিজেকে 'আহকার ইবাদুল্লাহ্' (আল্লাহ্ বান্দাগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম) লেখে আর এর দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে, এই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই সারা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম ব্যক্তি, এমনকি পৌত্তলিক এবং দুর্বৃত্তপরায়নদের থেকেও অধম। কেননা সে নিজেকে ' আহকার ইবাদুল্লাহ্ হিসেবে স্বীকার করছে, তবে এ কেমন নির্বুদ্ধিতা এবং কুটতর্ক হিসেবে গণ্য হবে! এটা তো পত্রে কোন ব্যক্তি বিনয় প্রদর্শনের জন্য লিখে থাকে।

তিনি বলেন, "গভীর দৃষ্টিতে দেখা উচিত যে, যে পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ জাল্ল শানুহু আঁ হযরত (সা.)-এর নাম 'আওয়ালুল মোমেনীন রেখেছেন এবং সমস্ত আনুগত্যশীলদের সর্দার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং সর্ব প্রথম আমানত ফেরতদানকারী নামে অভিহিত করেছেন, সেক্ষেত্রে এরপরও কি কুরআন করীমের কোন মান্যকারীর জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন করার অবকাশ থাকতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা উপরোক্ত আয়াতে ইসলামের জন্য একাধিক পদমর্যাদা রেখেছেন যেগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা সেটিই, যেটি তিনি আঁ হযরত (সা.) -এর প্রকৃতিকে কে দান করেছেন।" বিভিন্ন মর্যাদা রয়েছে ইসলামে আর সর্বোচ্চ মর্যাদা আঁ হযরত (সা.) -এর সত্তায়। কেননা, সেই মর্যাদা তাঁর প্রকৃতিকে আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন।

এরপর তিনি ফার্সি কবিতায় বলেন-

মুসা ও ঈসা তোমারই সৈন্য, এই পথে সকলে তোমার কল্যাণেই রয়েছে। মূসা ও ঈসা যারাই আছেন, তারা সকলে তোমার অনুসরণ করবেন। আয়াতের বাকি অংশের অনুবাদ হল, " আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাঁর রসুলকে বলেন, তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার পথই সরল পথ। অতএব তোমরা এই পথেরই অনুসরণ কর, ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না। কেননা

তা তোমাদেরকে খোদা তা'লা থেকে দূরে নিয়ে যাবে। তুমি তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমরা খোদা তা'লাকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। অর্থাৎ আমার কর্মপন্থা, যা ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য, সেই পথ অনুসরণ কর। খোদা তখন তোমাদেরকেও ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার পথ হল, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খোদার হাতে সোপর্দ করে দেওয়ার এবং কেবল বিশ্ব-প্রতিপালকের জন্যই উৎসর্গিত হওয়ার আমাকে আদেশ করা হয়েছে। ” আমাকে এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমার অনুসরণ করলে তোমরা সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে, প্রকৃত মুসলমান হবে। “প্রতিপালকের জন্য উৎসর্গিত হওয়ার অর্থাৎ তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। যেহেতু তিনি বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক, তাই আমি জগতসমূহের সেবক হব আর কায়োমনোবাক্যে তাঁকেই অনুসরণ করে চলব। অতএব, আমি সকল সত্তা আর যা কিছু আমার নিজের ছিল, তা সবই খোদার কাছে অর্পন করেছি। এখন কিছুই আমার নেই। যা কিছু আমার আছে, তা সবই তাঁর।”

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৬০-১৬৫)

এই ছিল সেই উচ্চ মর্যাদা যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এই প্রচ্ছদে আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

আঁ হযরত (সা.) ছিলেন আল্লাহ্ তা'লার পূর্ণ বিকাশ-স্থল। একথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

“কুরআন করীমের একাধিক স্থানে ইঙ্গিতে ও রূপকভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) ঐশী জ্যোতির্বিকাশের পূর্ণ বিকাশস্থল।” অর্থাৎ তিনি খোদা তা'লার সত্তার পূর্ণ বিকাশস্থল। “ এবং তাঁর বাণী খোদার বাণী, তার আবির্ভাব খোদার বিকাশ এবং তাঁর আগমণ খোদার আগমণের নামান্তর। কুরআন করীমে এ সম্পর্কে এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- তুমি বলে দাও সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা পলায়ন করেছে। মিথ্যার পলায়ন অনিবার্য ছিল। (বনী ইসরাঈল: ৮২) ‘হক’ বা সত্য বলতে এখানে মহাসম্মানিত খোদা তা'লা, কুরআন শরীফ এবং আঁ হযরত (সা.)কে বোঝানো হয়েছে এবং মিথ্যা বলতে শয়তান এবং শয়তানের দলবল ও তার শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, লক্ষ্য কর আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে নিজের নামের সঙ্গে আঁ হযরত (সা.)কে অন্তর্ভুক্ত করলেন আর এইভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবই খোদার প্রকাশ হওয়া হিসেবে পরিগণিত হল। এমন প্রখর ও প্রতাপশালী প্রকাশ, যার প্রভাবে শয়তান তার সৈন্য সামন্ত সহ পলায়ন করল আর তার শিক্ষা-দীক্ষা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়ে তার দলবল দারুণভাবে পর্যদুস্ত হল। এইভাবে পূর্ণ জমা-(মোকামে জমায় পরিপূর্ণতা)-এর কারণে সূরা আলে ইমরানের তৃতীয় রুকুতে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সকল নবীরসূলদের কাছে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, তাদের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য এবং অপরিহার্য যে, তারা খাতামুররুসুলের মহিমা ও প্রতাপ বা জালালের কারণে তাঁর উপরে অর্থাৎ, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর উপর ঈমান আনবে, এবং তাঁর সেই মহিমা ও সেই জালালের প্রচারণার কাজে মনপ্রাণ দিয়ে সহায়তা করবে। একারণেই, হযরত আদম সফিউল্লাহ্ থেকে নিয়ে হযরত মসীহ কলেমাতুল্লাহ্ পর্যন্ত যত নবী ও রসূল অতীত হয়েছেন তাঁরা সবাই আঁ হযরত (সা.)-এর মহিমা ও প্রখর প্রতাপের স্বীকৃতি ঘোষণা দিয়ে এসেছেন।

(সুরমা চাশমা আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৭-২৮০) যেভাবে খোদা তা'লা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, অনুরূপে আমাদের রসুল ব্যতীতও কোনও অনুসরণ যোগ্য নেতা নেই। আঁ হযরত (সা.)-এর এই উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করে হযরত মসীহ মওউদ তাঁর রচিত মিনানুর রহমান পুস্তকে বলেন:

অর্থাৎ: এরপর এক-অদ্বিতীয় খোদার বান্দা আহমদ বলে (খোদা তাকে নিরাপদে ও নিজ সাহায্যের আশ্রয়ে রাখুন)- খোদা ব্যতীত আমাকে কেউ বোঝায় নি আর তিনিই সর্বোত্তম বুঝিয়েছেন। আর তিনি আমাকে শিখিয়েছেন এবং উত্তম শিখিয়েছেন। আর আমাকে ইলহামের মাধ্যমে বলেছেন, ইসলামই হল আল্লাহ্ মনোনীত ধর্ম আর সত্য রসুল মুস্তাফা (সা.) ইমামগণের নেতা যিনি একজন উম্মী রসুল এবং আমীন (বিশ্বস্ত)। অতএব যেরূপে ইবাদত কেবল খোদার জন্যই স্বীকৃত আর যিনি এক-অদ্বিতীয়, অনুরূপভাবে আমাদের রসুল অনুসরণের দিক দিয়ে অদ্বিতীয় আর খাতামুল আম্বিয়া হওয়ার দিক থেকেও অদ্বিতীয়।

(মিনানুর রহমান, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৫৬-১৫৭)

এরা অভিযোগ করে যে, দাবির পূর্বে এক কথা বলেছিল আর দাবির পরে ভিন্ন কথা। তারা দেখুক যে, এই সব লেখাগুলি তো দাবির পর ১৮৯৫ সালের।

আঁ হযরত (সা.) নিজের জীবনের বাস্তব নমুনায় মানবীয় গুণাবলীকে চরম উৎকর্ষে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

“ আমাকে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ধর্ম অপেক্ষা ইসলাম ধর্মই সত্য। আমাকে বলা হয়েছে যে, সকল পথপ্রদর্শনের মধ্যে কেবল কুরআনের হিদায়াতই ত্রুটিবিহীন এবং মানবীয় সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত রয়েছে। আমাকে বোঝানো হয়েছে যে, সমস্ত রসুলদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষাদানকারী এবং উচ্চ মার্গের নমুনা প্রদর্শনকারী কেবল হযরত মহম্মদ (সা.) প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষাদানকারী।

(আরবাঈন, নম্বর-১, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৩৪৫)

তিনি বলেন: সেই পাদ্রী সাহেবগণ এখন কোথায় যার বলতেন যে, নাউযুবিল্লাহি, হযরত সৈয়্যদানা সৈয়্যুদুল ওয়ারা মহম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পায় নি। আমি সত্য সত্য বলছি, পৃথিবীকে তিনি কেবল একজনই এমন পূর্ণ মানব গত হয়েছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী ও দোয়া সমূহ গৃহীত হওয়া এবং অন্যান্য নিদর্শন সমূহ প্রকাশ পাওয়া এমন এক বিষয় যা এযাবৎ এই উম্মতের প্রকৃত অনুসারীদের মাধ্যমে স্রোতস্বীনি নদীর ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে। ” হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সমস্ত ধর্মকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, “ ইসলাম ব্যতীত সেই ধর্ম কোথায় যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট ও শক্তি রয়েছে আর সেই লোকগুলি কোথায় এবং কোন দেশে বাস করে যা যারা ইসলামী বরকত ও নিদর্শনের মোকাবেলা করতে পারে?

(আরবাঈন নম্বর-১, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৩৪৬)

আজও নিদর্শন দেখতে হলে কেবল ইসলামের মধ্যেই সেই নিদর্শন দেখা সম্ভব। সেই নিদর্শন তাদের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে যারা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রকৃত আনুগত্য করে। তিনি (আ.) বলেন:

“মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতীত কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং সকল আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভিন্ন কোন রসূল ও শাফী (সুপারিশকারী) নাই । অতএব, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন ও প্রতাপশালী নবীর সহিত সত্যিকার প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার ।

স্মরণ রাখিও যে, মুক্তি সেই জিনিষের নাম নহে যাহা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইবে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহাই যাহা এই দুনিয়াতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া থাকে। মুক্তি প্রাপ্ত কে? সেই ব্যক্তি, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার ও তাঁহার সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যবর্তী শাফী এবং আকাশের নীচে তাঁহার সম মর্যাদা বিশিষ্ট অপর কোন রসূল নাই। কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কাহাকেও খোদাতালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই কিন্তু এই মনোনীত নবী চিরকালের জন্য জীবিত। ..... হযরত মূসা (আ.) তাঁহার পূর্ববর্তী জাতিসমূহের হারানো ধন পাইয়াছিলে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই ধনের অধিকারী হইয়াছেন যাহা হযরত মূসা (আ.)-এর অনুগামীগণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এমতাবস্থায় মুহাম্মদী সিলসিলা মূসায়ী সিলসিলার স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু মর্যাদায় উহা হইতে সহস্র গুণে উচ্চ।”

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৩-১৪)

তিনি বলেন: আমি খোদাকে আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে পেয়েছি।

“সেই মহাশক্তিশালী, সত্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ খোদাকে আমার আত্মা ও এবং অস্তিত্বের প্রতিটি কণা সিজদা করে, যার হাতে প্রতিটি আত্মা এবং যাবতীয় শক্তিবৃত্তি সহ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রকাশ লাভ করেছে। যাঁর সত্তার কল্যাণে প্রতিটি সত্তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। কোন বস্তুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে আছে আর না আছে তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে, না তাঁর সৃষ্টির বাইরে। হাজার হাজার সালাম, দরুদ, রহমত ও বরকত নাযিল হোক সেই পবিত্র নবী মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর উপর যার

শেষাংশ ২০ পাতায়....

মানবতার সম্মান প্রতিষ্ঠার নিরিখে আলোকে মহম্মদ (সা.)-এর জীবনী

মূল উর্দূ : মহম্মদ ইনাম গৌরী, অনুবাদ: জহরুল হক (মুবাল্লিগ সিলসিলা গৌহাটি)

ہے:وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا۔ (سورۃ بنی اسرائیل:71)

এবং অবশ্যই আমরা আদম সন্তানদিগকে সম্মানিত করিয়াছি এবং আমরা তাহাদিগকে স্থলে ও সমুদ্রে আরোহণ করাইয়াছি এবং তাহাদিগকে পবিত্র রিযক দান করিয়াছি এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্য হইতে অনেকের উপর তাহাদিগকে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।

(বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৭১)

কুরআন করীমের উপরোক্ত আয়াতের পর এই প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি হাদীস কুদসী রয়েছে যার দ্বারা রসূলে করীম (সাঃ) আল্লাহতা'লার এই আদেশকে তুলে ধরে বলেছেন যে

“اَرَدْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ اٰدَمَ”

অর্থাৎ আল্লাহতা'লা এটা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, আমি যেন পরিচিত হতে পারি আর সেই কারণেই আমি আদম জাতিকে সৃষ্টি করেছি।

অন্য আরও একটি হাদিসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন যে :

হাদীস

অর্থাৎ আল্লাহতা'লা আদমকে নিজ শকল ও সুরাতে সৃষ্টি করেছেন। এখন কথা হচ্ছে যে, আল্লাহ্তা'লার তো কোন শকল ও সুরাত নেই। তাই এর অর্থ হবে যে মানুষ আল্লাহ্তা'লার গুনের আয়না স্বরূপ॥ তার জন্য শর্ত এটা হবে যে, সে যেন প্রকৃত মানুষ হয়। এখন দেখতে এটা হবে যে, মানুষের প্রকৃত অর্থ কী? সুতরাং মনে রাখা দরকার যে, ইনসান একটি আরবী শব্দ যার অর্থ হল এমন একটি সত্তা যার ভিতরে উনস্ অর্থাৎ দু'টি প্রেম পাওয়া যায়। অর্থাৎ একটিপ্রেম খোদার সহিত আর অপরটি খোদার সৃষ্ট জীবের সহিত। আর আল্লাহতা'লা প্রতিটি মানুষের ভিতরে দু'টি করে প্রেম সংযুক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই দু'টি প্রেম কারোর মধ্যে থেকে বেশি প্রকাশ পায় আর কারোর মধ্য হতে কম। আর কারোর নিজ কর্মের ফলে এই প্রেম একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। যার ফলে একজন মানুষ আর জন্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। আল্লাহতা'লা তার সৃষ্টির মধ্যে এমন একজন মানবকে সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে এই দুটি প্রেমই তার চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছে। সুতরাং সে খোদার প্রেমে খোদার ভালোবাসায় উপরে উঠতে চলে যায় আর এমন পর্যায় গিয়ে পৌঁছে যায় যে, তার বিরোধীরাও একথা বলতে বাধ্য হয়ে যায় যে **'আশেকা মুহাম্মাদুন রাব্বাহু'**। অর্থাৎ মহম্মদ রসূল (সাঃ) তো তার প্রতিপালকের প্রেমে বিভোর হয়ে গেছে।

আর যখন খোদার সৃষ্ট জীবের সঙ্গে প্রেম করলেন আর এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছালেন যে, আরশের খোদা ঘোষণা দিলেন (রহমাতুল্লিল আলামীন) এবং (রউফুর রহীম) এই পদে ভূষিত করলেন।

সুতরাং খোদাতা'লা এবং খোদাতা'লার সৃষ্ট জীবের ভালোবাসায়, সান্নিধ্যে, সহমর্মিতায় সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যান আর সেই কারণে তাকে পরিপূর্ণ মানব আখ্যা দেওয়া হয়।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠা প্রিয় হাবিব হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ মানব হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সুন্দর শব্দের মাধ্যমে বলেছেন যে :

“সেই যে সর্বোচ্চ স্তরের 'নূর' (আলো) যা মানবকে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ পূর্ণ-মানবকে, যা ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না, যা পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে ছিল না, নদী সমূহের ছিল না, ছিল না মুক্তো মানিক্যে, পান্নাতে আর মোতিতেও, তা ছিল কেবল মানবের মধ্যে অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে, যার শ্রেষ্ঠতম এবং পূর্ণতম, সর্বোত্তম এবং সুন্দরতম অস্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও প্রভু, নবীগণের নেতা অমর জীবনপ্রাপ্তগণের নেতা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রুহানী খাযায়েন ৫ম খণ্ড, ১৬০ ও ৬১ পৃষ্ঠা)

আর এই পরিপূর্ণ মানুষের কিভাবে পৃথিবীতে মানুষের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন তার কিছু কিছু অংশ আজকের সভাতে সময়ের স্বল্পতার মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করব, যদি আল্লাহ্তা'লা শক্তি দান করেন।

শ্রোতামণ্ডলী!

হযরত আকদাস মহম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের প্রাক্কালে মানুষের কোন সম্মান করা হত না-আর মানুষের প্রাপ্য তো একবারেই তাকে দেওয়া হত না। সুতরাং যার শক্তি তারই মাল ছিল :- দাস, মহিলা এবং চাকরানী এগুলো তো নিজেদের সম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত হত। সেই যুগে শুধু আরবই নয় বরং শিক্ষিত দেশগুলোতেও বিজয়ী জাতিরা তাদের বন্দিদেরকে দাসে পরিণত করত। আর বীনা যুদ্ধেই গরীব, অসহায় পুরুষ ও মহিলাদেরকে বিক্রী করা ও ক্রীতদাস বানানোর প্রথা চলে আসছিল।

কিন্তু হযরত রসূলে করীম (সাঃ) সর্ব প্রথম ক্রীতদাসদের মুক্তির কাজ আরম্ভ করেন। এবং তাঁর পবিত্র বিবি হযরত খাদিজার পক্ষ থেকে যে সমস্ত মাল এবং দাস পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে সর্ব প্রথম দাসদের মুক্তি দান করেন। একটি মানুষ শুধুমাত্র তার দরিদ্রতার কারণে সে বিক্রী হয়ে যাবে বা দাসত্বের শিকলে তাকে বাঁধা হবে এর আদেশ ইসলাম কখনই দেয় না। সুতরাং রসূলে করীম (সাঃ) বললেন যে :

“যে কেউ একজন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার কাছে কখনই জান্নাতের হাওয়া টুকুও পৌঁছাবে না।”

(বুখারী কিতাবুল বায়)

আর কুরআন করীম এর সূরা মহম্মদ এর আয়াত নাম্বার পাঁচে এটা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধাপরাধী হয়ে যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়বে তাদেরকে দয়া প্রদর্শন করে মুক্ত করে দাও অথবা বিনিময় নিয়ে - সুতরাং এই ঐশী আদেশ অনুযায়ী হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবনীতে অনেক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। তার মধ্যে শুধুমাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। হযরত জায়েদ বিন হারিসকে যখন একটি গোলাম রূপে হযরত খাদিজা (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে দিয়েছিলেন তখন না শুধু সেই জায়েদকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন বরং তাকে নিজের পোষ্যপুত্র রূপে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এবং তার সাথে এত বেশি পরিমাণের স্নেহ মায়া-মমতা দেখিয়ে ছিলেন যে, যখন জায়েদের প্রকৃত পিতা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন তখন জায়েদ (রাঃ) তার সাথে যাওয়ার জন্য অস্বীকার করেন এবং হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে থাকা এবং তার সেবা করাটাকেই শ্রেয়ঃ মনে করেন। আর এই মুক্তিকৃত গোলাম এর ছেলে উসামাকে এত সম্মান দিয়েছিলেন যে, নবী সাহেব তাঁর শেষ জীবনে যে সৈন্যদল তৈরী করেছিলেন তার কমান্ডার উসামাকেই করেছিলেন।

সুতরাং মানুষের সম্মান তো তখনই প্রকাশ করা হয় যখন আমরা সমাজের, জাতির, অনুন্নত এবং নিচু বর্গের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি।

তা নাহলে আজকের উন্নত ও **(Civilised)** মনে করা পৃথিবীতে তো প্রতিদিনই গরীব চাকর শ্রমিকদের সঙ্গে পশুসুলভ ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু মানবতার জন্য দয়ার মূর্তি হযরত মহম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, (বুখারী কিতাবুল আতক এর একটি হাদিস এর আনুবাদ) তোমাদের গোলাম তোমাদের ভাই - সুতরাং তোমাদের মধ্যে যখন কারো কাছে কোন গোলাম থাকবে তখন তোমরা সেই গোলামকে সেই খাবার খাওয়াবে যেটা তোমরা নিজেরা খাও। আর তাকে সেই বস্ত্র পরিধান করাবে যেটা তোমরা পর। আর তোমরা তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না যেটা তাদের ক্ষমতার বাইরে। আর যদি কখনও এই ধরনের কাজ দাও তাহলে নিজেরাই সেই কাজে সাহায্য করবে। সুতরাং হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর এই কথার উপরে পরিপূর্ণ ভাবে আমল করতে তার সাহাবাদের মধ্যে

দেখাত। সুতরাং আবু জার (রাঃ) একটি এমন পরিধান পরেছিলেন যেটা তার গোলামও পরেছিল। এবং সাহাবা যখন কোন সফরে যেতেন আর সেখানে বাহন একটিই হত তাহলে একবার মালিক নিজে এবং একবার চাকরকে চড়াতেন। অনুরূপভাবে সেই পরিবেশে মহিলাদেরকে পরিপূর্ণরূপে একটি নগন্য এবং অত্যাচারিত শ্রেণি বলে মনে করত। এবং হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর সময়ে তো মহিলাদেরকে মানুষই মনে করা হত না। বরং কন্যা সন্তানদের জন্মটাকে একটা খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হত।

আর সেই কারণে যার ঘরে কন্যা-সন্তান জন্মাতো সে এলাকাবাসীর কাছে মুখ লুকিয়ে বেড়াত। এবং কিছু পাষাণ মানুষ তো তার কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত কবরই দিয়ে দিত।

শ্রোতামণ্ডলী!

এটা তো আজ থেকে ১৪ শ’ বছর আগের কথা যেটা কোরআন ও হাদিস থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকের উন্নতশীল যুগেও দেখে নিন যে, মানুষের মধ্যে সমতা বজায় রাখার জন্য পুরুষ ও মহিলার ভিতরে সমস্ত ধরনের বিভেদকে দূরিভূত করার জন্য আইন তৈরী করা হয়েছে। এবং এটাও আইন তৈরী করা হয়েছে যে, কোন গর্ভবতী মহিলার যদি গর্ভ নির্ণয় করা হয় আর ছেলে না মেয়ে জন্মাবে নির্ধারণ করে যদি ভ্রূণ হত্যা করা হয় সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে সাইনবোর্ড লাগানো থাকে কেন ? কেননা আজকেও কন্যাসন্তানের জন্মকে অশুভ বলে মনে করা হয়। এবং গর্ভ অবস্থায় যদি বুঝতে পারে যে, কন্যা-সন্তান আছে তাহলে সেটা নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু সেই দয়ার মানব হযরত মহম্মদ (সাঃ) মেয়েদের সুশিক্ষা দেওয়া ও তালিম ও তরবিয়ত করার দিকে আকৃষ্ট করতে গিয়ে বলেন যে : “যে ব্যক্তি দু’জন কন্যা-সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে সেই ব্যক্তি আর আমি জান্নাতে এমন ভাবে পাশাপাশি থাকব যেমনভাবে একহাতে দুটি আঙ্গুল পাশাপাশি থাকে।” (মুসলিম শরীফ)

স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কথা বলতে গিয়ে বলেন যে : “তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজ স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে। এবং নিজ আদর্শ দেখাতে গিয়ে বলেন যে : (“আনা খায়রুকুম লি আহ্‌লি”) তোমরা কি দেখনা যে, আমি আমার স্ত্রীদের সাথে কত উত্তম ব্যবহার করি।” (তিরমিযী)

তারপর মায়ের সম্মান এভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে : “জান্নাত তোমাদের মায়ের পায়ের নীচে আছে।” (নিসাঈ)

এবং প্রতিটি মুহূর্তে মহিলাদেরকে সম্পত্তির অংশিদার করেছেন এবং পুরুষদেরকে এটা ক্ষমতা দেন নাই যে, তারা তাদের স্ত্রীদের অনুমতি ছাড়া তাদের মালের উপরে নিজের মনমানি করবে ?

শ্রোতামণ্ডলী!

বর্তমান যুগে গরীব ও মিসকীনদের এমন তুচ্ছ মনে করা হয় যে, অনেকেই তাদের সাথে কথা বলা পছন্দ করেন না।অনেকে তাদেরকে পাশে বসানো বা তাদের পাশে বসা পছন্দ করেন না। এবং তাদের সঙ্গে চলা ফেরাও সম্মানহানির কারণ মনে করে- কিন্তু আমাদের প্রিয় দয়ার সাগর নবী করীম (সাঃ)-এর এই বিষয়ে চরিত্রই আলাদা ছিল : তিনি দোয়া করতেন হে আল্লাহ! আমাকে তুমি মিসকীন বানিয়ে রাখবে এবং মৃত্যুর পরে যখন আমাকে উঠাবে তখনও মিসকীনের অবস্থায় আমাকে উঠাবে। (তিরমিযী)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একজন গ্রাম্য লোক ছিল যার নাম ছিল জাহির - তার চেহারাও অনেক কুৎসিৎ ছিল- একবার সে বাজারে তার জিনিষ বিক্রী করছিল এবং ঘামে ভিজেছিল এমন সময় প্রিয় নবী (সাঃ) তার পিছন থেকে গিয়ে তার কাঁধের উপরে হাত রাখে এবং সেই ব্যক্তি যখন বুঝতে পারেন যে, এটা রসূলে পাক (সাঃ)-এর হাত তখন সে তার নিজের পিঠ ও শরীর হুজুর (সাঃ)-এর শরীরে খুশির সাথে মলতে থাকেন। তখন হুজুর (সাঃ) বলেন যে, আমার এই গোলামটা কে কিনবে ? তখন সেই ব্যক্তি বলেন যে, হে আল্লাহর রসূল তাহলে আপনি অনেক খারাপ সওদা কিনবেন। আমাকে কেনার মত কোন ব্যক্তি নেই। তখন রসূলে করীম (সাঃ) বলেন না-না তুমি তো কম মূল্যের জিনিষ নও বরং আল্লাহর নিকট তোমার অনেক মূল্য রয়েছে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল ৩য় খণ্ড)

আঁ হযরত (সাঃ) গরীব এবং মিসকীন ব্যক্তিদের খাবার খাওয়ানোর প্রতি খুব জোর দিতেন এবং তিনি বলতেন যে, সেই দাওয়াত দাওয়াত নয় যেগুলিতে শুধুমাত্র বড়লোকদের ডাকা হয় আর গরীবদেরকে ডাকা হয় না।

(বুখারী কিতাবুন নিকাহ্)

শ্রোতামণ্ডলী!

মানবতা শুধুমাত্র রক্তে মাংসে তৈরী শরীরের নাম নয়, যাকে কোন একটি উঁচু স্থানে তুলে রেখে তার সম্মান করা হবে বা তার ইবাদত করা হবে, বরং মানবতা তো সেই ব্রেণ বা চিন্তাধারার নাম যা সেই ব্যক্তির চরিত্র দিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যদি সেই চিন্তাধারা উন্নত মানের হয় আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাহলে বলা যেতে পারে যে, মানবতার সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই ব্যক্তি।

এই নিরিখে যদি আমরা আমাদের মুনিব হযরত মহম্মদ (সাঃ)-কে দেখি তো এমন বিস্ময়কর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় যেটা অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না বা পাওয়া অনেক কষ্টকর। একজন মানুষ তার আত্মীয়-স্বজন, নিজ চিন্তাধারার লোকজন বা প্রিয়জনদের সাথে তো ভালো ব্যবহার করে কিন্তু দেখতে এটা হবে যে, অন্যদের সাথে কিরূপ ব্যবহার বা (দুশমন) শত্রুদের সঙ্গে তার ব্যবহার কেমন।

একটি ঘটনা এইরূপ যে,

একবার মদীনাতে একটি ইহুদীর জানাযা আসছিল- নবী করীম (সাঃ) জানাযার সম্মানে দাঁড়িয়ে যান। কেউ বলেন হুজুর এটা তো ইহুদীদের জানাযা ছিল- তিনি বলেন যে, এর মধ্যে কি জীবন বা আত্মা ছিল না, সে কি মানুষ ছিল না ?

(বুখারী কিতাবুল জানায়েয)

হযরত ইয়ালী ইবনে মাররা বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে অনেক সফর করেছি আর এটা প্রত্যক্ষ করেছি যে, যখনই তিনি (সাঃ) কোন মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখতেন তো সেটাকে দাফন করে দিতেন এবং কখনও এটা জিজ্ঞেস করতেন না যে, সেই মৃত ব্যক্তি মুসলমান কি-কাফের ?

সুতরাং বদরের যুদ্ধের সময় রসূলে পাক (সাঃ) কাফেরদের ২৪টি মৃত দেহকে এক এক করে কবর দেন, যেটিকে কালিবে বদর বলা হয়।

(বুখারী কিতাবুল মাগাজী)

আহযাবের যুদ্ধের সময় কাফেরদের একজন সর্দার নওফিল বিন আব্দুল্লাহ্ মাযরমী মুকাবিলা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং কাফিরে মক্কারা ওহুদের যুদ্ধের সময় রসূলে পাক (সাঃ)-এর চাচা হযরত হামজা (রাঃ)-এর নাক কান কেটে তার মৃত দেহের মসলা করেছিল আর এটাই তাদের নিয়ম। আর সেই কারণে তারা ভীষণ আতঙ্কিত ছিল যে, এবার আমাদের সর্দারের সঙ্গে মুসলমানরা এরকম ব্যবহার না করে। আর সেই ভয়ে কাফেররা রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে খবর পাঠালেন যে, দশ হাজার দেরহাম টাকা নিয়ে নওফিলের মৃতদেহ আমাদেরকে দিয়ে দিন।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ,

আমরা মৃত মানুষের দাম নিই না, তোমরা তোমাদের মৃতদেহ এসে নিয়ে যাও।

(দালাইল-এ-নবুয়াত - লিল বাইহাকী ৩য় খণ্ড)

মদীনাতে একটি ইহুদী ছেলেকে রসূলে পাক (সাঃ) ঘরের কাজের জন্য রেখেছিলেন। যখন সেই ছেলেটা অসুস্থ হয়ে যায় তখন নবী করীম (সাঃ) তাকে দেখতে আসেন।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড)

আঁ হযরত (সাঃ)-এর একজন সাহাবী ছিলেন নাম হল সামামা বিন আসাল সে ইয়ামামার বাসিন্দা ছিল। তার পক্ষ থেকে মক্কাবাসীর জন্য গম আসত। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং শুনলেন যদি মক্কার লোকেরা নবী করীম ৯সাঃ)-এর সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন তখন তিনি বললেন যে, আজকে থেকে গমের একটি দানাও মক্কাতে পাঠাব না। সুতরাং মক্কার লোকেরা মুশকিলে পড়ে গেলেন। যখন সামামা বিন আসাল মক্কায় আসলেন এবং মক্কার লোকদেরকে বললেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রিয় নবী না হুকুম দিবেন তোমাদেরকে গম দেওয়ার, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে গম দেব না। তখন মক্কাবাসীরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে অনুরোধ করলেন যে, আপনি তো দয়া করার কথা বলেন, আর আমাদের গমের আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে আমরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যাচ্ছি আমাদের প্রতি করুণা করুন। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলে করীম (সাঃ) সামামাকে আদেশ দিলেন যে, হে সামামা! মক্কাবাসীদেরকে গম

দেওয়া বন্ধ করো না। সুতরাং দয়াবান এই মহান পুরুষের কারণে মক্কাবাসীর আবারও গম আসা শুরু হয়ে যায়।

(আসসিরাতুন নবীবিয়া লি ইবনে হিশাম)

লাহোর থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা ‘সৎ উপদেশ’ এর এডিটর সাহেব ৭ই জুলাই ১৯১৫ সনের পত্রিকায় লেখেন যে :- “মানুষেরা বলে যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে কিন্তু আমি একথায় বিশ্বাস রাখি না। কেননা, ইসলামের প্রবর্তক মহম্মদ (সাঃ)-এর ভিতরে অত্যাধিক শক্তি ছিল। সকল মানুষের জন্য তাঁর হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা ছিল। তাঁর মধ্যে প্রেম-প্রীতির পবিত্র শক্তি কাজ করত। এবং শুভচিন্তা তাঁর দিক নিদর্শন করত।”

শ্রোতামণ্ডলী!

এগুলি সেই পবিত্র চরিত্রের কয়েকটি উদাহরণ ছিল যেগুলি মানুষের সম্মানার্থে রসূলে পাক (সাঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যদি আমরা বিস্তারিত বিবরণ নিই তাহলে বুঝতে পারব যে, প্রতিটি মানুষের প্রাথমিক চাহিদা এটাই থাকে যে, কেউ আমার ক্ষুধা নিবারণ করুক। কেউ আমাকে পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করে দিক। কেউ তার শরীর ঢাকার ব্যবস্থা করে দিক, কেউ তাকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে পড়ে না থাকতে সাহায্য করুক। সুতরাং বর্তমানে উন্নত যুগেও প্রতিটি মানুষের এই চাহিদা, রুটি, কাপড় এবং ঘর এর ব্যবস্থা করে দেওয়াটাই মানুষের সেবার উন্নত মার্গ বলে মনে করে। কিন্তু আজকেও আমরা শুনতে ও দেখতে পাই যে, এই ধরনের আওয়াজ উঠানো অনেক উন্নতমানের দেশও একশ শতাংশ এই কাজে সফলতা অর্জন করতে পারে নি। এবং অনুন্নত দেশগুলোতে তো এর আরও অবস্থা খারাপ। কিন্তু আজ থেকে চোদ্দ শ’ বছর আগেই মানুষের এই প্রাথমিক দাবির কথা ঘোষণা করে বলেছিল যে, অর্থাৎ হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের জন্য এটা শিরধার্য করা হয়েছে যে, তোমরা পৃথিবীতে না তো ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকবে আর না পরিধান বিহীন থাকবে আর না তো পিপাসার্ত অবস্থায় থাকবে আর না তো রৌদ্রের মধ্যে থাকবে। সুতরাং আঁ হযরত (সাঃ) এবং তার পর খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে এই শিক্ষার উপরে আমল করতে দেখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম শাসকদের মধ্যে মানুষের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয় আর শাসকরা আত্মকেন্দ্রিক স্বাধিকার ও স্বজন পোষণে বেশি নজর দেওয়া শুরু করে তখন মানুষের মধ্য থেকে মানবতার যে গুণাবলী সেগুলি দূর হতে থাকে আর বর্তমান যুগে তো সাধারণ মানুষ ও শাসকগোষ্ঠী একে অপরের উপরে নগ্ন তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলি মানবতার এই পরিপূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা তৈরী করে থাকে। মালিকানা থেকে সামাজিক পরিকাঠামোকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চলছে। এবং গরীব ও ধনী ব্যক্তির মধ্যে বরাবর হক প্রদানের যে চেষ্টা চলছিল সেটাও বিফল হয়ে যায়। ধনী ধনকুবের হতে চলেছে আর গরীব আরও গরীব হতে চলেছে। আর এই কারণে মানুষ মানুষের শত্রু হয়ে চলেছে।

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের প্রাথমিক চাহিদার জিনিসগুলি চিহ্নিত করে সেগুলি পূরণের চেষ্টা করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ধরনের মানবতার কথা বলা বেকার হবে। আর মানুষ শান্তির সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারবে না। আর এটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অর্থনীতিকে বুঝে তার উপরে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা হবে এবং হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর শিক্ষার উপর আমলকারী হবে। যার মধ্যে প্রথম শর্ত হল : ধন-সম্পত্তির সঠিক ভাবে ভাগ বন্টন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বংশের মধ্যে ছেলে হোক বা মেয়ে তাদের প্রকৃত প্রাপ্যের অংশ দিতে হবে। আর যখন এই ধরনের বন্টন হবে তখন কয়েকজনের হাতেই ধন-সম্পদ একত্রিত হয়ে থাকবে না।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ইসলাম এটা বলেছে যে, টাকা পয়সা একত্রিত করে জমিয়ে রাখা যাবে না। সেজন্য খোদাতা’লার বলেছেন:

‘যারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করে রাখে এই পৃথিবীতে কেয়ামতের দিন সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যকে উত্তপ্ত করে তাকে দাগ দেওয়া হবে।

(সূরা তওবা, আয়াত : ৩৪-৩৫)

বিশেষ করে পুরুষদেরকে রেশম এবং সোনা ব্যবহারে মানা করা হয়েছে। এবং ঘরে সোনা এবং রূপার বাসন-পত্র ব্যবহারেও বারণ করা হয়েছে। তৃতীয় রাস্তা এটা রয়েছে যে : সুদের ব্যবসা নিষিদ্ধ, কারণ এতে টাকা দিয়ে টাকা উপার্জন করা হয়, যার ফলে ধনী ব্যক্তি ধনী হতে চলে যায় আর গরীব মানুষ গরীব হতে চলে যায়। সুতরাং সুদ একটি কলঙ্ক মানুষের উপরে চড়ে রয়েছে। পৃথিবী যদি আজ শান্তিতে বসবাস করতে চায় তাহলে সুদকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দিতে হবে। আর ধন-সম্পদকে কয়েকটি হাতে জমা হওয়া থেকে বাঁচাতে হবে।

চতুর্থ উপায় হল : মানুষের মধ্যে দয়া, এবং মায়া সৃষ্টির উপায় বের করতে হবে,দুঃখ-দুর্দশা নিবারণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আল্লাহ্‌তা’লা বলেছেন যে : -তিনিই সেই খোমাদের সকলের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেগুলির উপরে সকল মানুষের অধিকার রয়েছে। যদি খোদাতা’লা কাউকে বুদ্ধি বেশি দিয়েছেন যার দ্বারা সে বেশি উপার্জন করতে পারে তো মনে রাখা দরকার যে, তার প্রয়োজনাতীত মালের উপরে গরীব অসহায় যার বুদ্ধি কম তার অবশ্যই অধিকার রয়েছে। আর এই জন্য ইসলামে যাকাত এর কথা বলা হয়েছে। আর তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সেই সমস্ত জিনিস-পত্র যেগুলি অপ্রয়োজনে বছরাধিক সময় পড়ে থাকে তার উপরে যাকাত নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। এবং প্রয়োজনের চেয়ে অধিক গহনার উপরেও জাকাত নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। এইভাবে দয়াপ্রবণ হয়ে মানব সেবার কথা ইসলামে বলা হয়েছে। শ্রোতামণ্ডলী!

এছাড়াও মানবতার সব থেকে বড় বিপদ যেটা আগেও ছিল আর আজও আছে সেটা হল- জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বিভাজন। আর এই বিভাজন এত নিচু পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, মানুষ মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না। বোমা বিস্ফোরণ, ড্রোন হামলা এবং বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের হাতিয়ার দ্বারা, নিরীহ্ শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ নিষ্পাপ মানুষকে হত্যার কথা প্রতিদিন শুনতে ও দেখতে পাওয়া যায়। আর কুরআন করীম এই ধরনের হত্যাকে সমগ্র মানব জাতির হত্যার ঘোষণা দিয়ে বলেছে যে :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হত্যা করল বদলা ছাড়া অথবা দেশে কলহ বিশৃঙ্খলার কারণ ছাড়া সে যেন সমগ্র মানবমন্ডলীকে হত্যা করল আর যে একটা জীবন বাঁচাল সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে বাঁচাল।

(সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩৩)

সন্ত্রাসবাদ মুসলিম হোক বা হিন্দু উন্নতদেশের হাতিয়ার সাপ্লায়ার হোক বা অনুন্নত দেশের বা এই বিধ্বংসী হাতিয়ার ক্রয়কারী হোক যতক্ষণ পর্যন্ত এই দয়ার মূর্তি মানব হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষার উপরে আমল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে ভয় থাকবে।

আর এই শান্তিময় বাণীকে নিয়ে আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্জা মাসরূর আহমেদ সাহেব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধানদেরকে এবং বড় বড় পার্লামেন্টে গিয়ে নিজ বক্তব্য দ্বারা পৃথিবীকে সতর্ক করে চলেছেন সুতরাং হুজুর আনোয়ার (আইঃ) ১১ই জুন ২০১৩ সনে ইংল্যান্ডে জামাতে আহমদীয়ার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে পার্লামেন্ট হাউস-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে :

“হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর পবিত্র জীবনটাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আর এটাই নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের সব থেকে বড় উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্যই একদিন এমন আসবে যেদিন পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারবে যে, হযরত মহম্মদ (সাঃ) কোন ধরনের অন্যায়-অত্যাচারের শিক্ষা নিয়ে পৃথিবীতে আসেন নাই। সমগ্র মানব জাতি এটা বুঝতে পারবেন যে, মহম্মদ (সাঃ) শুধুমাত্র প্রেম-প্রীতি ও সহমর্মীতার বাণী নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। জামাতে আহমদীয়া সেই শিক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত আর সেই শিক্ষা অনুযায়ী কাজ কর্ম করে চলেছে। আর এই সেই সহমর্মীতার শিক্ষা, ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা, দয়াদ্রতার শিক্ষা, যেটা পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করছি। আমরা আহমদী মুসলমান যারা আঁ হযরত (সাঃ)-এর সেই ঐতিহাসিক উদাহরণ বিহীন, অদ্বিতীয় নম্রতা, প্রেম-প্রীতির শিক্ষার আদেশ দিই।

(বিশ্ব সংকট ও শান্তির বাণী, পৃষ্ঠা : ১২৭)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া, ইংল্যান্ডের ৯তম বাৎসরিক শান্তি-সম্মেলনের সময় বলেন যে :

আমরা জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরা যথাযথ এই চেষ্টায় রত আছি যে, পৃথিবী এবং মানবতাকে ধ্বংস থেকে বাঁচানো হোক। এর

কারণ হল আমরা বর্তমান যুগের ইমামকে মান্য করেছি যাকে আল্লাহ তালা মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রূপে পাঠিয়েছেন। আর তিনি দয়ার সাগর হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর চাকর হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন। কেননা আমরা আমাদের প্রিয় নবী মহম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষার উপরে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি আর সেই কারণেই বর্তমানে পৃথিবীর চরম অবস্থা দেখে আমরা চরম দুঃখিত ও মর্মাহত। আর পৃথিবীর মানুষকে দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচানোর এটাই কারণ। আর এই জন্য আমি নিজে এবং জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যরা এই নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য বদ্ধপরিকর।

(বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, পৃষ্ঠা : ৪৬)

তিনি ১১ই জুন ২০১৩ তে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে আরও বলেন যে :

“সময়ের এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হল- বিশ্ব শান্তির জন্য এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের জন্য আমরা সকলে মিলে একে অপরের সম্মান করি এবং এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকেদের সম্মান করবে। আর যদি তা না করি তাহলে বিভীষিকাময় ফলাফল বের হতে পারে। পৃথিবী একটি গ্রামের রূপধারণ করে নিয়েছে।

সুতরাং একে অপরের প্রতি সম্মানভাবনা ক্ষুন্ন হওয়ার কারণে এবং শান্তি ভঙ্গের কারণে শুধুমাত্র স্থানীয় জনগন বা শহরের বা দেশের মধ্যেই ক্ষতি হবে না বরং সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসের কারণ হবে। আমরা সকলেই বিগত দু’টি বিশ্ব যুদ্ধের কু-পরিণাম থেকে অবগত এবং বর্তমানে কোন কোন দেশের কিছু খারাপ নিয়ম নীতির কারণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের মাথার উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে পশ্চিমা দেশগুলিতেও দীর্ঘমেয়াদী ভয়াবহ পরিণাম আমরা দেখতে পাব। আসুন আমরা নিজেকে এই ধ্বংসাত্মক পরিণাম থেকে বাঁচিয়ে নিই। আসুন আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এই ধ্বংসাত্মক কুপরিণতি থেকে বাঁচিয়ে নিই। আর এই যুদ্ধ আনবিক যুদ্ধ হবে। আর পৃথিবী যেদিকে এগোচ্ছে তাতে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে। আর এই বিভিষীকাময় পরিণতি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল- ইনসাফ, দিয়ানতদারী, ঈমানদারী এই গুণগুলি আমাদের মধ্যে তৈরী করতে হবে। আর সেই শক্তিকে সকলে মিলে বাধা দিতে হবে যারা ঘৃণা, অশান্তির হাওয়া চালিয়ে পৃথিবীটাকে বসবাসের অযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছে।

আমার ইচ্ছা এবং দোয়া যে, খোদাতা’লা বড় বড় শক্তিশালি শাসকগোষ্ঠীকে ইনসাফের সাথে তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দান করুন। আমিন।

(বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, পৃষ্ঠা : ১২৯)

শ্রোতামণ্ডলী!

দয়ার মূর্তমান প্রতীক হযরত আকদাস মহম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–তার জীবনের যে শেষ হজ্ব যাকে হুজ্জাতুলবিদা বলা হয় তাতে তিনি (আঃ) যে খোতবা প্রদান করেছিলেন সেটা মানুষের মাথা উঁচু করার এবং উঁচু পতাকার মত কেয়ামত পর্যন্ত উড়তে থাকবে, এবং মানব জাতিকে মানবতার শিক্ষা দিতে থাকবে। সুতরাং তিনি (সাঃ) সন ৯ হিজরীর ১১তারিখের জিলহজ্ব মাসে সেই সময় উপস্থিত

মণ্ডলীর সামনে যে খোতবা প্রদান করেছিলেন তার কিছু অংশ এইরূপ :

হে মানব মণ্ডলী! শোন, তোমাদের খোদা একজনই, যেমনটি তোমাদের পিতা একজন। অর্থাৎ তোমরা সকলেই আমাদের বংশধর। কোন আরবের লোকের প্রাধান্য নেই কোন অনারবের উপর। অনুরূপভাবে না তো কোন গৌরাঙ্গর প্রাধান্য আছে কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যে খোদাভীরুতা অবলম্বন করে। তোমরা শুনে রাখ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তাকওয়া অবলম্বন করে ও উত্তম ব্যবহার করে। সকল মানুষ সে যেকোন জাতির বা কোন পদের অধিকারী হোক না কেন সকলেই মানুষ হিসাবে সমান। আর এই কথা বলতে গিয়ে (সাঃ) নিজের দু’টো হাত উঠালেন আর দুই হাতের অঙ্গুলী একত্রিত করে বললেন, যেভাবে এই দুই হাতের অঙ্গুলী সমান সমান অনুরূপভাবে সমগ্র মানব সন্তান সমান। তোমাদের একে অপরের উপর ফজিলত প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা একে অপরের ভাই ভাই।

যাই হোক তিনি (সাঃ) একটা বড় খোতবা প্রদান করেন যাতে তিনি (আঃ) বলেন :

নিজ অধিনে থাকা লোকজন, চাকর, মহিলা সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দান করতে গিয়ে শেষে বলেন যে, এই উপদেশ শুধুমাত্র আজকের বা কালকের জন্য, বরং ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তোমরা খোদাতা’লার সহিত সাক্ষাৎ না কর। তিনি আরও বলেন যে, এই যে কথা যেটা আমি আজকে তোমাদেরকে বলছি এটা পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছে দেবে। কেননা এরকমও হতে পারে যে, আজবে যারা আমার সামনে শুনছে তাদের চেয়ে বেশি এই আদেশের পালনকারী তারাও হতে পারে যারা এখন আমাকে শুনছে না।

(কিতাবুল বুখারী, মাগাজী বাব হজ্জাতুল বিদা)

একজন ভারতীয় দর্শনবিদ মিষ্টার কে. এস. রামাফ্কৃষ্ণ রাও যিনি অনেক বইও লিখেছেন এবং ২০১১ তে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাকে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, তিনি ১৯৯৬ সনে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) মানবতার সম্মান প্রতিষ্ঠার কারণে যে চেষ্টা চালিয়েছেন সেই বিষয়ে এইভাবে লেখেন যে,

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার নিয়ম নীতি সামঞ্জস্যতার শিক্ষা যেটা মহম্মদ (সাঃ) দিয়েছেন সেটা পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সকল বড় বড় ধর্মে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহম্মদ (সাঃ) নিজ কর্মের দ্বারা কাজ করে দেখিয়েছেন। এবং শত শত বছর পরে যখন আন্তর্জাতিক সচেতনা বোধ জেগে উঠবে ও জাতীয়তাবাদের বিভেদ উঠে গিয়ে একটি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সকলকে বাধা হবে তখন হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর মহত্ব সকলে বুঝে উঠবে। আরবের মধ্যে এই ধরনের নীতি-নিয়ম সচারাচর চোখে দেখা যেত যে, যারা শক্তিশালী, তারা নিজ শক্তি দ্বারা অন্যের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করত। কিন্তু ইসলাম অসহায় নিঃস্ব লোকের জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরী হল। আর তাতে বলা হল যে, মহিলারা তাদের পিতার সম্পত্তির দু’ই ভাগ পাবে। কিন্তু ইংল্যান্ড যেটাকে জনগণের দেশ বলা হয় এবং প্রাথমিক দেশের মধ্যে গণ্য হয় সেখানে ১৮৮১ সনে ইসলামের এই শিক্ষা কে গ্রহণ কর। আর একটি আইন The Married Woman’s Act নামে তৈরী করা হয়। ইতিহাসের সাক্ষী থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মহম্মদ (সাঃ)-এর সাথীগণ বা বন্ধুগণ অথবা শত্রুদের মধ্যে সকলেই এটা স্বীকার করেছেন যে, মহম্মদ (সাঃ)-এর জীবন চরিত নিষ্কলুষ, ঈমানপূর্ণ, খোদাভীরুতা ছাড়াও প্রতিটি দিক থেকে তার মত আদর্শ মানুষ পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। বলা হয় যে, একজন আমানতদার মানুষ খোদার সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-মহম্মদ (সাঃ) আমানত ও দিয়ানত এর চরম পর্যায়ে উপনীত ছিলেন, মানবতা তার রক্তের মধ্যে মিশানো ছিল। তার আত্মা মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিল ও সর্বদা মানব প্রেমের গীত তিনি গাইতেন। মানুষের সেবা করা, মানুষকে বড় করা, মানুষকে পবিত্র করা, মানুষকে শিক্ষা দেওয়া, মানুষকে মানুষ হিসাবে তৈরী করা তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও গীত ছিল যেটা তাঁর কথা, চিন্তাধারা এবং কর্ম থেকে প্রকাশ পেয়েছে সেটা হল মানবতার কল্যাণ। (উসওয়ায়ে ইনসানে কামিল, লেখক হাফিজ মুজাফ্ফর আমহ সাহেব, পৃষ্ঠা : ৬২৮ থেকে ৬২৯)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আঃ) নিজ কবিতার লাইনে লিখেছেন :

ইউরোপের অবুঝ লোকেরা বলে, এই নবী পরিপূর্ণ নয়। অমানুষদের মধ্যে দ্বীনের কাজ করা কোন বড় কাজ ছিল না। কিন্তু অমানুষকে মানুষ তৈরী করা একটি বিষ্ময়কর ঘটনা এবং নবুওয়াতের অর্থ এই কাজের মধ্যেই নিহীত আছে। সুতরাং এটা সত্য যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর মো’জেযার মধ্যে সব থেকে বড় মোজেযা যে, তিনি আরবের জানোয়ারতূল্য মানূষকে মানুষ হয়ে গড়ে উঠার শিক্ষা দেন। এবং সমস্ত গুণ আত্মস্ত করার পর খোদার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তৈরী করেছেন। এবং মানুষ হিসাবে মানুষের সম্মান প্রতিষ্ঠার দিক থেকে তাদেরকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দেন।

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের এই মহান নবীর উপরে চির শান্তি বর্ষিতকরুন এই পৃথিবীতে এবং পরকালে।

ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদো লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

****

আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবানী, আপনি যখন ভাল আছেন, তখন আমি আর কারো জন্য চিন্তা করি না।’

খৃষ্টান জগত মরিয়ম মগদীলিনীর এবং তাঁর সাথীদের সেই বাহাদূরী খুশী প্রকাশ করেন যে, তারা খুব ভোরে শত্রুদেরকে লুকায়ে মসীহ (আ.) -এর কবরেরর কাছে গিয়েছিলেন। আমি তাদের বলতে চাই যে, আস এবং আমার প্রিয়তমের (সা.) একনিষ্ঠ ও আত্মনিবেদিত অনুসারীদেরকে দেখ! কি অবস্থার মধ্যে তাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং কি অবস্থায় তাঁরা তওহীদের পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন।

মহানবী (সাঃ) এর জীবনী- ওহোদের যুদ্ধের আলোকে

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) রচিত ‘নবীয়োঁ কা সর্দার’ পুস্তক থেকে উদ্ধৃত

কাফেরদের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু যাওয়ার সময় এই ঘোষণাও দিয়ে গেল যে, তারা আগামী বছর পুনরায় মদীনা আক্রমণ করবে, এবং তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিবে। বস্তুত: এক বছর পরেই তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এল। মক্কাবাসীদের ক্রোধের অবস্থা এই ছিল যে, বদরের যুদ্ধের পর তারা ঘোষণা দিয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি তার মৃতের জন্য কাঁদতে পারবে না, এবং যে সব বানিজ্য কাফেলা আসবে সেগুলোর মালমাতা মুনাফা আগামী যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ থাকবে। অতএব, তারা পুরাদস্তুর প্রস্তুতি গ্রহণ করলো এবং আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন সহস্রাধিক সৈন্যের এক সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এল। রসূলে করীম (সা.) সাহাবাগণের কাছে পরামর্শ চাইলেন, ‘আমাদের কি শহরের ভিতরে থেকে যুদ্ধ করা উচিত, না বাইরে গিয়ে?’ তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ছিল যে, শত্রুকে আগে আক্রমণ করতে দেওয়াই উচিত, যাতে যুদ্ধ করার দায়-দায়িত্ব তাদের স্কন্ধেই বর্তায়, এবং মুসলামানরা নিজেদের ঘর থেকে সহজেই তাদেরকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু নওজওয়ান মুসলমানরা যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায় নি এবং সেজন্য মনেমনে অস্থির ও উত্তেজিত ছিল, তারা ভাবলো যে, এবারে হয়তো তারা শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে। তাই, তারা বললো, ‘আমাদেরকে কেন শাহাদত থেকে বঞ্চিত করা হবে?’ কাজেই, তিনি (সা.) তাদের কথা মেনে নিলেন।

পরামর্শ নেওয়ার সময় তিনি (সা.) একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, ‘স্বপ্নে আমি একটি গাভী দেখলাম। আমি দেখলাম যে, আমার তরবারির ডগা ভেঙ্গে গেছে। আমি আরও দেখলাম ঐ গাভীটি যবাই করা হচ্ছে। এবং আবারও দেখলাম যে, আমি আমার হাত একটা শক্ত ও সুনির্মিত বর্মের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমি আরও দেখলাম যে, আমি একটি মেষের উপর সওয়ার হয়েছি। সাহাবারা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনার এই স্বপ্নে তরবারির ব্যাখ্যা কি? তিনি (সা.) বললেন, ‘গাভী যবাই করার অর্থ হচ্ছে, আমার কোন সাহাবী শহীদ হবেন। তরবারির আগা ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্য থেকে কোন এক বড় ব্যক্তি শহীদ হবেন, অথবা আমি নিজেই কোন কষ্ট পাব। এবং বর্মের মধ্যে হাত ঢোকানোর তাবীর, আমার মনে হচ্ছে-মদীনার ভিতরে থেকে যুদ্ধ করাই আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে। এবং মেষের উপর সওয়ার হওয়ার তাবীর মনে হচ্ছে কাফেরদের সেনাবাহিনীর কামান্ডারের উপর আমরা বিজয় লাভ করব। অথবা সে মুসলমানদের হাতে মারা যাবে। ’

এই স্বপ্নের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে এটা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তাদের পক্ষে মদীনার ভিতরে থাকাই অধিকতর সুবিধাজনক হবে। কিন্তু, স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা ছিল রসূলে করীম (সা.)-এর নিজের, এই ব্যাখ্যা ঐশী ছিল না। কাজেই, তিনি অধিকাংশের মতামতকেই গ্রহণ করলেন। এবং যুদ্ধের জন্য শহর থেকে বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। যখন তিনি বাইরে এলেন, তখন নওজওয়ানরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বিব্রত বোধ করতে লাগল এবং বলল,

‘ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার পরামর্শই সঠিক। আমাদের উচিত মদীনার ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করা।’

আঁ হযরত (সা.) বললেন-

“আল্লাহ্‌র নবী যখন বর্ম পরিধান করে, তখন তা আর খুলে ফেলে না। এখন যাইহোক না কেন আমরা অগ্রসর হব। তবে, তোমরা যদি ধৈর্য সহকারে কাজ করো, তাহলে তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবে।’

এই কথা বলে তিনি (সা.) এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ মদীনা ছেড়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এবং কিছু দূর অগ্রসর হয়ে রাত কাটাবার জন্য শিবির স্থাপন করলেন।

আঁ হযরত (সা.) সব সময় এই নীতিই অবলম্বন করতেন যে, তিনি শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলে নিজের সৈন্যদেরকে কিছু বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিতেন,যাতে করে সৈন্যরা তাদের যুদ্ধ-সামগ্রী ঠিক ঠাক করে নিতে পারে। ফজরের নামাযের সময় যখন তিনি বাইরে এলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, কিছু সংখ্যক ইহুদী কবিলা তাদের সঙ্গে চুক্তির বাহানায় যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য এসেছে। যেহেতু ইহুদীদের চক্রান্তের কথা তাঁর জানা ছিল, সেহেতু তিনি তাদের ফেরৎ যেতে বললেন। এতে মুনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবায় বিন সুলুলও তার তিনশ’ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে ফিরে গেল এবং সে বলল, ‘এখন এটা তো কোন যুদ্ধ হবে না, হবে ধ্বংসের মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করা। কেননা, নিজেদের সাহায্যকারীদেরকে যুদ্ধ থেকে বাদ দেওয়া হল। ফল এই হল যে, মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র সাত শ’তে। যা সংখ্যার দিক থেকে কাফেরদের সৈন্যসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও কম। এবং যুদ্ধ-সামগ্রী আরও কম কেননা, কাফেরদের বর্মধারী সৈন্য সংখ্যায় ছিল সাত শ’। পক্ষান্তরে মুসলমানদের বর্মধারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র এক শ’। এছাড়া, কাফেরদের ছিল দু’শত ঘোড়-সওয়ার। অপরদিকে, মুসলমানদের ছিল মাত্র দু’টি ঘোড়া।

যাহোক, আঁ হযরত (সা.) ওহোদ প্রান্তরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি একটি গিরিপথ পাহারা দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ জন সৈন্যের একটি দলকে মোতায়েন করলেন, এবং তাদের কমান্ডরকে বার বার জোর দিয়ে বললেন, ‘এই গিরিপথ এত গুরুত্বপূর্ণযে, আমরা এদিকে মরি বা বাঁচি, তোমরা কিছুতেই এই স্থান ত্যাগ করবে না। ’ অতঃপর, তিনি বাদবাকি সাড়ে ছয় শত সৈন্য নিয়ে শত্রুর মোকাবেলার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। এক্ষণে তাঁর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো শত্রুসৈন্যের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। যুদ্ধ শুরু হল। এবং আল্লাহ্ তা’লার সাহায্যে ও সহায়তায় কিছুক্ষণের মধ্যেই সাড়ে ছয় শ’ মুসলিম সৈন্যের কাছে মক্কার

তিন হাজার সুদক্ষ ও অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত যোদ্ধা পরাজয় বরণ করল এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রাণের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে লাগল।

বিজয় পরাজয়ে পরিণত হল

মুসলমান সৈন্যরা পলায়নপর সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল। যে সকল সৈন্য গিরিপথ পাহারায় নিয়োজিত ছিল তারা তাদের কমান্ডারকে বলল, ‘এখন তো শত্রু পরাজিত হয়েগেছে, এখন আমাদেরকেও পুণ্য অর্জন করতে দেওয়া হোক।’ কমান্ডার তাদেরকে বারণ করলেন। এবং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু সৈন্যরা বলল, ‘রসুলুল্লা (সা.) যা বলেছিলেন, তা শুধু জোর দেওয়ার জন্যই বলেছিলেন। তাঁর কথার অর্থ এই ছিল না যে, শত্রু পালাতে থাকবে আর তোমরা সব ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকবে।’ এই কথা বলেই তারা গিরিপথ ত্যাগ করল এবং যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যেতে লাগল। পলায়নপর শত্রুদের মধ্যে ছিল খালিদ বিন ওলীদ (যিনি পরবর্তীকালে ইসলামের একজন সুদক্ষ জেনারেল হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন)। খালেদের দৃষ্টি পড়ল ফাঁকা গিরিপথের উপর। সেখানে তখন মাত্র কয়েকজন সৈন্য তাদের কমান্ডারের সাথে পাহারা দিচ্ছিল। খালেদ কাফেরদের অপর এক জেনারেল আমর বিন ইবনুল আসকে হাঁক ছেড়ে বলল, ‘একটু পিছনে গিরিপথের দিকে তাকাও।’ আমর বিন আস যখন গিরিপথের দিকে তার দৃষ্টি ফেরাল, তখন সে বুঝতে পারল, সে আজ জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সুযোগ পেয়ে গেছে। উভয় জেনারেল তাদের পলায়নপর সামলিয়ে নিল এবং মুসলিম সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেল। যে ক’জন মুসলিম সৈন্য গিরিপথ রক্ষার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে পিছন দিক থেকে এসে আচমকা ইসলামী সৈন্যের উপর আক্রমণ করে বসল। তাদের বিজয়সূচক স্লোগান শুনে তাদের পলায়নপর সৈন্যরাও আবার যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়ে এল। এই আক্রমণ এত আকস্মিক হয়েছিল এবং কাফেরদের পিছনে ছুটতে ছুটতে মুসলিম সৈন্যরা এত দূর দূর স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মুসলমানরা কেউই দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার মত অবস্থায় ছিল না। তারা একত্রিত হতে পারল না। যুদ্ধের ময়দানে তাদের একেক জন একেক জায়গায় একলা যুদ্ধ করতে লাগল। যাদের অনেকেই শহীদ হয়ে গেলেন। বাকীসব এই ভেবে হতভম্ব হয়ে পড়ল যে, আসলে হল টা কি? অনেকে আবার পিছনের দিকে ছুটে গেল। মাত্র কয়েকজন সাহাবী দৌড়ে গিয়ে রসুলে করীম (সা.)-এর পাশে সমবেত হলেন। তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী হলেও ত্রিশের বেশি হবে না।

যে স্থানটায় রসুলে করীম (সা.) দাঁড়িয়ে ছিলেন, কাফেররা সেই স্থানটায় প্রচণ্ড হামলা চালাতে থাকল। তাঁকে (সা.) রক্ষা করতে গিয়ে একের পর এক সাহাবী শহীদ হতে লাগলেন। তলোয়ারধারী সৈন্য ছাড়াও তীরন্দাজ সৈন্যরা উঁচু উঁচু টিলার উপরে দাঁড়িয়ে রসুলে করীম (সা.)-এর উপর অজস্র তীর বর্ষণ করতে লাগল, ঐ সময় তালহা (রা.) যিনি ছিলেন মক্কার কোরায়েশ বংশের লোক এবং মোহাজের তিনি লক্ষ্য করলেন, প্রত্যেকটা তীর ছোঁড়া হচ্ছে রসুলে করীম (সা.)-এর চেহারার দিকে তাক করে। তিনি তখন তার হাত রসুলে করীম (সা.)-এর মুখে সামনে তুলে ধরে আড়াল দিলেন। তীরের পর তীর এসে পড়ছিল এবং তালহা সেগুলোকে হাত দিয়ে ঠেকাচ্ছিলেন। জানবাজ এবং বিশ্বস্ত সেই সাহাবী নিজের হাতকে একটুও সরাচ্ছিলেন না। তীরের পর তীরের আঘাতে তার হাত ক্ষতবিক্ষত হতে হতে শেষ হয়ে গেল। একটা হাত তার ভাল হয়েছিল। কয়েক বৎসর পর ইসলামের চতুর্থ খলীফার সময় যখন মুসলমানদের মধ্যে যখন গৃহযুদ্ধ হচ্ছিল তখন একজন শত্রু বিদ্রূপ করে তালহাকে বলেছিল, ‘হাত-কাটা নুলা’। এই কথা শুনে একজন সাহাবী আর একজন সাহাবীকে বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ নুলাই তো বটে, কিন্তু কত মুবারক এই নুলা; কত আশিসমন্ডিত!! তুমি কি জান তালহার এই হাত নুলা হয়েছে রসুলে করীম (সা.)-এর মুখমণ্ডল রক্ষা করতে গিয়েই। ওহোদের যুদ্ধের পর এক ব্যক্তি তালহাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তীরগুলো যখন আপনার হাতে এসে পড়ছিল, তখন কি আপনি ব্যাথা পাচ্ছিলেন না? আপনি কি উহ্ আহ্ করছিলেন না?’ উত্তরে তালহা (রা.) বলেছিলেন, ‘ব্যাথা তো লাগছিলই, মুখ থেকেও উহ্ আহ্ বের হতে চাচ্ছিল। কিন্তু আমি উহ আহ করি নি এই ভয়ে যে, পাছে উহ্ করতে গিয়ে না আবার হাত সরে যায়, আর তক্ষুনি তীর এসে পড়ে রসূলে করীম (সা.)-এর চেহারার উপর।’

এই কয়েকটি মানুষ আর কতক্ষণ এত বড় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। কাফের সেনাবাহিনীর একটা দল অগ্রসর হয়ে এলো এবং তারা রসুলে করীম (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বের সৈন্যদেরকে আক্রমণ করে পিছু হটিয়ে দিল। রসূলে করীম (সা.)- সেখানে একাকী পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রচণ্ড বেগে ছুড়ে মারা একখণ্ড পাথর এসে তাঁর কপালে পড়লো এবং গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করল। হেলমেটের কাঁটা তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয়ে গেল। তিনি অজ্ঞান হয়ে সেই সাহাবীদের (রা.) লাশের উপরে গিয়ে পড়লেন, যারা তাঁর পাশে থেকে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছে। এরপর আরও কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা.) তাঁর দেহের হেফাযত করতে গিয়ে সেখানেই শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁদের লাশগুলিও আঁ হযরত (সা.)-এর দেহের উপর গিয়ে পড়ল। কাফেররা তাঁর দেহকে ঐসব লাশের নীচে পড়ে থাকতে দেখে মনে করল যে, তিনি (সা.) মারা গেছেন। কাজেই মক্কার সৈন্যরা নিজেদের বাহিনীর লাইন ঠিক করার জন্য পিছনে সরে গেল, যে সাহাবারা তার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং যাঁদেরকে কাফেররা আক্রমণ করে পিছনে হটিয়ে দিয়েছিল তাদের মধ্যে হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, যুদ্ধের ময়দান খালি হয়ে গেছে, আর কেউ নেই, তখন তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে, রসূলে করীম (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। এবং সেই ব্যক্তিকে যিনি পরবর্তীকালে একই সময়ে রোমান সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, যার হৃদয় কখনও ভীত হত না, ঘাবড়াতো না, তিনিও একটা পাথরের উপরে বসে বাচ্চাছেলের মত কান্না শুরু করে দিলেন। এতে মালেক (রা.) নামক একজন সাহাবী, যিনি ইসলামী সেনাবাহিনীর বিজয়ের পর পিছনে চলে গিয়ে ছিলেন, (কারণ রাতভর কিছু খেতে না পেয়ে তিনি তখন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং কিছু খেজুর সংগ্রহ করে পিছনের দিকে চলে গিয়েছিলেন যাতে খাতিরজমা বসে খেয়ে নিয়ে ক্ষুধা মেটাতে পারেন)। তিনি বিজয়ের আনন্দে হেলেদুলে আসছিলেন। এবং হযরত উমরের কাছে এসে পৌঁছলেন। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, উমর! আপনার কি হয়েছে? ইসলামের বিজয়ে তো আপনার আনন্দিত হওয়ার কথা। উত্তরে উমর (রা.) বললেন, ‘হতে পারে তুমি বিজয়ের পর পিছনে চলে গিয়েছিলে। তুমি জান না যে, কাফেরদের বাহিনী পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে ইসলামী ফৌজকে হামলা করে এবং যেহেতু মুসলিম সৈন্যরা সকলেই ছড়িয়ে, ছিটিয়ে পড়েছিল, তাই তাদেরকে আর প্রতিহত করা যায় নি। রসুলে করীম (সা.) জন কয়েক সঙ্গীসহ তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মন হয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছেন।’ মালেক (রা.) বললেন, একথা যদি সঠিক হয়, তাহলে এখানে বসে কাঁদছেন কিসের জন্য? যে জগতে আমাদের প্রিয়মত চলে গেছেন, আমাদের তো উচিত সেখানেই চলে যাওয়া। এই কথা বলে তিনি তাঁর হাতের যে শেষ খেজুর মুখে দিতে যাচ্ছিলেন তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, ‘হে খেজুর! মালেক ও জান্নাতের মাঝে এখন তুমি ছাড়া আর কি কোন বাধা আছে? এই কথা বলে তিনি তৎক্ষণাৎ তলোয়ার হাতে শত্রুদের সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। প্রায় তিন হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে একটি মানুষ কী-ই আর করতে পারে। তবু, এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী আত্মা তো বহু লোকের চাইতে ভারী হয়ে থাকে। মালেক এমন ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধ করতে লাগলেন যে, শত্রুরা প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়ল। কিন্তু, অবশেষে তিনি আহত হয়ে পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়েও শত্রুদের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই থাকলেন। মক্কার কাফেররা তাঁর উপর সমবেত হামলা চালালো। এবং এত অসংখ্য আঘাত করল যে, যুদ্ধের পর তাঁর লাশের সত্তরটি টুকরা পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর লাশ সনাক্ত করাই যাচ্ছিল না। শেষে একটি আঙুল দেখে তাঁর বোন তাঁকে চিনতে পারেন এবং বলেন, ‘এটাই আমার ভাইয়ের লাশ।’ যে সাহাবারা (রা.) রসূলে করীম (সা.)-এর চতুর্দিকে ব্যুহ রচনা করে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং পরে কাফেরদের আক্রমণের চাপে পিছু হতে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা যখন দেখলেন

যে, কাফেরদের সেনাবাহিনী চলে গেছে, তখন তাঁরা পুনরায় রসুলে করীম (সা.)-এর পাশে ফিরে এলেন। তাঁরা তাঁর পবিত্র দেহ উপরে নিয়ে এলেন। একজন সাহাবী উবায়দা বিন আশ জাবাহ (রা.) নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে তাঁর (সা.) মাথায় ঢুকে পড়া খিল খুব জোরে টেনে তুললেন, এতে তাঁর দুটি দাঁত ভেঙ্গেই যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে রসুলে করীম (সা.)-এর জ্ঞান ফিরে এল। সাহাবারা যুদ্ধের ময়দানে চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন যেন মুসলমানেরা দ্রুত একত্রিত হয়। ছড়িয়ে পড়া সৈন্যরা পুনরায় সমবেত হতে লাগল। রসূলে করীম (সা.) তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের এক প্রান্তে চলে গেলেন। যখন পাহাড়ের প্রান্তে মুসলিম সৈন্যরা একত্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান খুব জোরে হাঁক ছেড়ে বলল, ‘আমরা মুহাম্মদকে হত্যা করেছি।’

রসূলে করীম (সা.) আবু সুফিয়ানের ঐ কথার কোন উত্তর দিলেন না। কেননা, শত্রুরা তাদের অবস্থান জানতে পেরে পুনরায় হামলা করে বসতে পারে। এবং জখম হওয়া মুসলমানরা আবারও শত্রুর আক্রমণের শিকারে পরিণত হবে। ইসলামী সৈন্যদের পক্ষ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আাবু সুফিয়ানের নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে, তার নিজের ধারণাই সঠিক এবং সে তখন খুব জোরে চীৎকার করে বললো, ‘আমরা আবু বাকারকে হত্যা করেছি।’

রসুলে করীম (সা.) হযরত আবু বাকার (রা.) কে কোন উত্তর দিতে বারণ করলেন। আবারও আবু সুফিয়ান চীৎকার করে বলল,‘ আমরা উমরকেও হত্যা করেছি। ’ উমর (রা.) ছিলেন খুবই তেজস্বী মানুষ, তিনি চাইলেন যে, তিনি জবাব দেন, ‘আমরা সবাই আল্লাহ্র ফযলে জীবিত আছি। এবং তোমাদের মোকাবেলার জন্যও প্রস্তুত।’ কিন্তু রসূল করীম (সা.) নিষেধ করে বললেন, ‘মুসলমানদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলিও না, চুপ থাক।’ এবারে কাফেরদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, ইসলামের প্রবর্তক এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর ডান হাত ও বাম হাত উভয়কেই তারা হত্যা করতে পেরেছে। এইভেবে, আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা উল্লসিত হয়ে উঠল এবং তাদের জাতীয় জয়ধ্বনি দিতে লাগল, ‘উলো হোবল উলো হোবল!’ আমাদের সম্মানিত দেবতা হোবলের মর্যাদা বুলন্দ হোক! তিনি আজ ইসলামকে শেষ করে দিয়েছেন।’

রসূলে করীম (সা.)-যিনি তাঁর নিজের মৃত্যুর ঘোষণায়, আবুবকরের (রা.) মৃত্যুর ঘোষণায়, উমরের (রা.) মৃত্যুর ঘোষণায়, চুপ করে থাকতে বলেছিলেন, এইভেবে যে, পাছে শত্রু না আবার জখমী মুসলমানদের উপরে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে, এবং পরিশ্রান্ত মুসলমানরা শহীদ হয়ে যায়। এখন, যখন এক আল্লাহ্র সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন দেখা দিল, এবং যুদ্ধের ময়দানে শিরকের স্লোগান দেওয়া হল, তখন তাঁর আত্মা বিচলিত হয়ে উঠল তিনি দারুন উত্তেজনায় সাহাবাদের দিকে ফিরে বললেন,

‘তোমরা সব জবাব দিচ্ছ না কেন?’ সাহাবারা বললেন, ‘ ইয়া রসুলাল্লাহ্ কি জবাব দিব?’ তিনি বললেন, ‘বল আল্লাহো, আলা ওয়া আজাল্লো, আল্লাহো ‘আলা ওয়া আজাল্লো।’

অর্থাৎ তোমরা মিথ্যা বলছ যে, হোবলের মর্যাদা উচ্চ হয়েছে, বরং যে আল্লাহ্ এক ও অংশীদারবিহীন তাঁর মর্যদাই সর্বোচ্চ।’ এবং এভাবে তিনি তাঁর দুশমনকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা সবাই জীবিত আছেন। এই বীরোচিত ও তেজোদ্দীপ্ত উত্তর শত্রুদের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করল যে, তাদের আশা ভরসা সব মাটিতে মিশে গেল। এবং তাদের সামনে সামনে পরিশ্রান্ত ও আহত মুসলিমদের দাঁড়িয়ে থাকা জেনেও যাদেরকে আক্রমণ করে তারা খুব সহজেই মেরে ফেলতে পারত, তাদের আর আক্রমণ করতে সাহস পেল না, এবং যতটুক বিজয় তাদের ভাগ্যে জুটেছিল তাতেই সন্তুষ্ট থেকে মক্কার পথে ফিরে চলল।

ওহোদের যুদ্ধে স্পষ্ট বিজয় লাভের পরও বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল, কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, এই যুদ্ধ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যতার এক বড় নিদর্শন ছিল। এই যুদ্ধে রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই তাঁর প্রিয় চাচা হামযা (রা.) শহীদ হন। আবার রসুল করীম (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক যুদ্ধ শুরুর দিকেই কাফের সেনাবাহিনীর এক বড় নেতা নিহত হয়। আবার রসুল করীম (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই তিনি নিজেই আহত হন এবং কিছু সংখ্যক সাহাবীও শহীদ হন। এই সব ঘটনা ছাড়াও, মুসলমানদের সত্যনিষ্ঠা ও ঈমানের এমনই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। এই সত্যনিষ্ঠা ও ঈমানের কিছু ঘটনার কথা তো ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আরও একটি ঘটনা উল্লেখের দাবি রাখে যা থেকে বোঝা যায় যে, মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সা.) -এ সংসর্গ সাহাবাদের হৃদয়ে কত অটল ঈমান সৃষ্টি করেছিল! যখন রসুল করীম (সা.) কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা.) কে নিয়ে পাহাড়ের প্রান্তদেশে চলে গেলেন এবং শত্রুরাও পিছনের সরে গেল, তখন কোন কোন সাহাবাকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন ময়দানে যায় এবং আহত সৈনিকদের খোঁজ খবর নেয়। একজন সাহাবী ময়দানে খোঁজ করতে করতে একজন আহত আনসারীর কাছে যান এবং দেখেন তাঁর অবস্থা খুব সংকটজনক এবং প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এই সাহাবী (রা.) তাঁর খুব কাছে গিয়ে তাঁকে ‘আসসালামো আলাইকুম’ বললেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে তাঁর হাত উঠালেন মুসাফাহ করার জন্য। এবং তাঁর হাত ধরে বললেন, ‘আমি অপেক্ষা করছিলাম, কেউ আসে কি না। আগত সাহাবী তাঁকে বললেন, ‘আপনার অবস্থা তো ভাল মনে হচ্ছে না, আপনার কি কোন কথা বলার আছে, যা আপনার আত্মীয় স্বজনের কাছে বলতে হবে? ’ ঐ মুমূর্ষ সাহাবী (রা.) বললেন, ‘হ্যাঁ, আমার পক্ষ থেকে আমার আত্মীয় স্বজনদের কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিবেন এবং বলবেন যে, আমি মরে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের কাছে আমি আল্লাহ্ তা’লা এক পবিত্র আমানত মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সা.)-কে রেখে যাচ্ছি। হে আমার ভাইয়েরা এবং আত্মীয়স্বজনেরা! তিনি আল্লাহ্র সত্য রসুল, আমি এই প্রত্যাশা করি যে, তাঁর হেফাযতের খাতিরে তোমরা তোমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। এবং তোমরা আমার এই ওসীয়্যত স্মরণ রাখিও (মুয়াত্তা ও যুরকানী)। মুমূর্ষু মানুষের মনে হাজারো কথা আসে আত্মীয় স্বজনের কাছে বলার জন্য। কিন্তু এই সমস্ত লোক মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহর (সা.) প্রেমে এত বেশি আত্মবিলীন ছিলেন যে, মৃত্যুর সময় না তারা ছেলেমেয়েদের কথা মনে করতেন, না তাদের বিধবা স্ত্রীদের কথা, না ধন-সম্পত্তির কথা। মৃত্যুর সময় তাঁদের শুধু এক ব্যক্তির কথাই মনে হত এবং তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সা.)। তাঁরা এটা জানতেন যে, পৃথিবীর পরিত্রাণ বা নাজাত ঐ এক ব্যক্তির হাতেই ন্যস্ত। আর আমাদের মৃত্যুর পর যদি আমাদের সন্তান সন্ততিরা জীবিত থাকে, তাহলে তারা হয়তো কোন মহত্তর কাজ করতে পারবে না। কিন্তু তারা যদি এই পরিত্রাণ কর্তার হেফাযত করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয় তাতে হয়তো আমাদের বংশ লোপ পেয়ে যাবে, কিন্তু পৃথিবী জীবন লাভ করবে। শয়তানের খপ্পরে পড়ে থাকা মানুষেরা আবার মুক্তি পাবে। আমাদের বংশধরদের জীবনের চাইতে হাজারো গুণ বেশি মূল্যবান জীবনের অধিকারী আদম সন্তানেরা পরিত্রাণ লাভ করতে থাকবে।

যাহোক, রসুলে করীম (সা.) অনেক আহতকে এবং শহীদকে একত্রে জমা করালেন। আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করালেন। শহীদগণের দাফনের বন্দোবস্ত করলেন। এমন সময় তিনি জানতে পারলেন যে, জালেম কাফেররা অনেক শহীদের নাক, কান কেটে ফেলেছে। যাঁদের কান কাটা হচ্ছিল দেখা গেল, তাদের মধ্যে খোদ রসুলে করীম (সা.)-এর চাচা হযরত হামযাও (রা.) ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি দারুণভাবে শোকাহত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, কাফেররা তাদের নিজেদের এই অন্যায় কাজের জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ করে দিল, যা আমরা অবৈধ মনে করতাম। কিন্তু খোদা তা’লার তরফ থেকে ঐ সময়ে ওহী নাযেল হল, কাফেরা যা করেছে, তাদেরকে করতে দাও। তুমি রহম ও ইনসাফের আঁচল কখনওই ছেড়ে দিও না।

ওহোদ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং মদীনাবাসীদের আত্মবিলীনতা

ইসলামী সৈন্যবাহিনী মদীনার দিকে রওনা হল। কিন্তু ইতিমধ্যে রসুলে করীম (সা.) -এর শাহাদতের গুজব এবং ইসলামী সেনাবাহিনী পর্যদুস্ত হওয়ার খবরাদি মদীনায় ছড়িয়ে পড়ল। মদীনার মহিলা এবং ছেলেমেয়েরা পাগলের মত ছুটতে লাগল ওহোদের প্রান্তরের দিকে। তাদের অধিকাংশ রাস্তার মধ্যেই সঠিক খবর পেয়ে থেমে গেল। বনু দীনার কাবিলা এক মহিলার উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে ওহোদ পর্যন্ত পৌঁছলেন। তিনি পাগলীনির মত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৌড়াচ্ছিলেন। তাঁর স্বামী, ভাই ও পিতা ওহোদের যুদ্ধে নিহত

হয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁর এক ছেলেও নিহত হয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর পিতার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হল, তখন তিনি বললেন, ‘রসুল করীম (সা.)-এর খবর কি?’ সংবাদদাতা যেহেতু জানতেন যে, রসুলে করীম (সা.) জীবিত আছেন, সেহেতু তিনি ঘুরে ফিরে মহিলাকে তাঁর ভাই, তাঁর স্বামী ও ছেলের মৃত্যুর খবরই দিচ্ছিলেন। কিন্তু মহিলাও ঘুরে ফিরে শুধু একই কথা বলছিলেন, ‘রসুলুল্লাহ (সা.)! আপনি এটা কী করলেন? বাহ্যিকভাবে এই কথাটিকে ভ্রমাত্মক মনে হয়। এবং এ জন্যই ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, কথাটার অর্থ ছিল, ‘রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবস্থা কি? ’ কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, কথাটা ভ্রমাত্মক ছিল না। স্ত্রীলোকদের বিশেষ বাচনভঙ্গি অনুসারে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। স্ত্রীলোকদের ভাবাবেগ বেশী এবং তারা কোন কোন সময় মৃত ব্যক্তিকে ধরে নিয়েই তাকে সম্বোধন করে কথা বলে। যেমন, অনেক স্ত্রীলোক ছেলে মারা গেলে তার লাশকে সম্বোধন করে বলে, ‘আমাকে ফেলে গেলে। এই বুড়ো বয়সে কেন আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। ’ এটা শোকাভিভূত মানুষের প্রকৃতির একটি সূক্ষ্ম প্রকাশ মাত্র। তাই, রসুল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে ঐ মহিলার অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল। কিছুতেই তাঁকে (সা.) মৃত ভাবতে পারছিলেন না। এবং অপরদিকে সত্যতা ঠিক যাচাইও করতে পারছিলেন না। এ জন্যও শোকার্ত অথে ঐ কথাই বলছিলেন যে, ইয়া রসুলাল্লাহ্ (সা.) আপনি এটা কি করলেন? অর্থাৎ এমন বিশ্বস্ত ও দয়ালু ব্যক্তি আমাদেরকে এত বড় দুঃখ কি করে দিলেন?

লোকেরা যখন দেখলেন যে, মহিলার বাপ, ভাই এর কোন তোয়াক্কা নেই, তখন তাঁরা তাঁর প্রকৃত অনুভূতি বুঝতে পারলেন এবং তাঁকে বললেন, ‘অমুকের মা। তুমি যেমন চাচ্ছ, রসূল তেমনই আল্লাহ্র ফযলে ভাল আছেন।’ এতে মহিলা বললেন, ‘দেখাও তিনি কোথায়?’ লোকেরা বললেন ,‘সামনে এগিয়ে যাও পাবে, তিনি ঐ, ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন।’ মহিলা এক দৌড়ে রসুল (সা.)-এর কাছে পৌঁছে গেলেন। এবং তাঁর আচল ধরে বললেন,

‘ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবানী, আপনি যখন ভাল আছেন, তখন আমি আর কারো জন্য চিন্তা করি না।’

এই তো সেই ঈমানের দৃষ্টান্ত যা পুরুষরা দেখিয়েছিলেন যুদ্ধে। ইহাতে সেই আন্তরিকতা যা দেখিয়ে ছিলেন নারী, যার কিছু উদাহরণ এখানে আমি তুলে ধরলাম। খৃষ্টান জগত মরিয়ম মগদীলিনীর এবং তাঁর সাথীদের সেই বাহাদূরীতে খুশী প্রকাশ করেন যে, তারা খুব ভোরে শত্রুদেরকে লুকায়ে মসীহ (আ.) -এর কবরেরর কাছে গিয়েছিলেন। আমি তাদের বলতে চাই যে, আস এবং আমার প্রিয়তমের (সা.) একনিষ্ঠ ও আত্মনিবেদিত অনুসারীদেরকে দেখ! কি অবস্থার মধ্যে তাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং কি অবস্থায় তাঁরা তওহীদের পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন।

এই ধরণের আত্মোৎসর্গের আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে ইতিহাসে। যখন রসুল করীম (সা.) শহীদগণের দাফনের কাজ সমাধা করে মদীনায় ফিরে আসছিলেন, তখন আবারও নারীরা এবং ছেলেমেয়েরা শহরের বাইরে এল তাঁকে স্বাগতম জানাতে। রসূল করীম (সা.) -এর উটনীর লাগাম ধরে আসছিলেন মদীনার এক নেতা সায়াদ বিন মোয়ায। এবং তিনি দুনিয়ার সামনে একথা বলছেন দেখ, আমরা মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সা.) সহী সালামতে ঘরে নিয়ে এসেছি। শহরের কাছাকাছি এলে তাঁর বুড়ি মা, যাঁর দৃষ্টি শক্তি কমে গিয়েছিল, তিনিও এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। ওহোদের যুদ্ধে তাঁর এক ছেলে উমর বিন মোয়ায শহীদ হয়েছিলেন, তাঁকে দেখে সা’দ বিন মোয়ায বললেন, ‘ইয়া রসুলুল্লাহ্! আমার মা, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মা আসছেন।’ তিনি (সা.) বললেন, ‘অনেক বরকত ও আশিসের সঙ্গে আসছেন। বুড়ি এগিয়ে এলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখার জন্য তাঁর দুর্বল দৃষ্টি দিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন। শেষে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল এবং তিনি খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ‘মা মনি! তোমার ছেলে শহীদ হওয়াতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। আমি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।’ এই কথা শুনে ঐ পুণ্যবতী মহিলা বললেন, ‘হুযুর! আমি যখন আপনাকে ভাল অবস্থায় দেখেছি, তক্ষুণি আমি আমার সব দুঃখ বেদনাকে রোস্ট করে খেয়ে ফেলেছি। ’ কি সুন্দর বাচন-ভঙ্গি! ভালবাসার কি গভীর অনুভূতি! চিন্তা ভাবনাই তো মানুষকে খেয়ে ফেলে, অথচ তিনি কত উদ্দীপনার সঙ্গে বলছে যে, ছেলের চিন্তা আমাকে কি খেয়ে ফেলবে? যতক্ষণ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (সা.) বেঁচে আছেন, ততক্ষণ আমি আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনাকেই গিলে খাব। আমার ছেলের মৃত্যুর দুঃখ তো আমাকে মারতে পারবে না। বরং সে যে রসূল করীম (সা.)–এর জন্য প্রাণ দিতে পেরেছে, সেই আমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে।’ হে আনসার! আমার জীবন তোমাদের জন্য কোরবানী হোক। কত না মহান পুরস্কার তোমরা পেয়ে গেছ!

যাইহোক, ভালোই ভালোই রসূলে করীম (সা.) মদীনায় পৌঁছে গেলেন। যদিও ঐ যুদ্ধে অনেক মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন এবং অনেকে আহত হয়েছিলেন,তবু ওহোদের যুদ্ধকে পরাজয় বলা সমীচীন হবে না। আমি যে সকল ঘটনার বিবরণ দিয়ে এসেছি, সেগুলোকে সামনে রেখে বলা যায় যে, এই যুদ্ধেও এক বিরাট জয় অর্জিত হয়েছে। এ এমন এক বিজয় যার কথা মনে করে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের ঈমান আরও বেশি উদ্দীপ্ত করতে পারবে, জোরদার করতে পারবে। মদীনায় পৌঁছে আঁ হযরত (সা.) পুনরায় তাঁর আসল কাজ অর্থাৎ তালীম, তরবীয়ত এবং ইসলাহে নফস বা শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও আত্মিক সংশোধনের কাজে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু, তিনি সকল কাজ অবাধে ও সহজে করতে পারেন নি।

ওহোদের যুদ্ধের পর ইহুদীদের মধ্যে আরও বেশি করে উৎসাহের সৃষ্টি হল এবং মুনাফেকরাও আবার মাথা তুলতে শুরু করল। তারা মনে করল, ইসলামকে ধ্বংস করা লৌকিক শক্তি দ্বারাই সম্ভব। কাজেই, ইহুদীরা মদীনাতে থেকেই আঁ হযরত (সা.) কে কষ্ট দেওয়া আরম্ভ করে দিল। তারা অশ্লীল সব কবিতা রচনা করে তাঁর এবং তাঁর পরিবারে অবমাননা করতে লাগল। একটি ঝগড়া মীমাংসা করার জন্য আহূত হয়ে তিনি (সা.) ইহুদীদের কেল্লায় গেলেন। ইহীদরা সিদ্ধান্ত নিল তিনি যেখানে বসবেন, সেখানে উপর থেকে একটা পাথর ফেল তাঁকে হত্যা করা হবে। কিন্তু, খোদা তা’লা ব্যাপারটা তাঁকে যথাসময়ে অবহিত করলেন এবং তিনি কাউকে কিছু না বলেই সেখান থেকে চলে এলেন। পরে ইহুদীরা তাদের এই অপরাধ স্বীকার করেছিল।

২এর পাতায় পর.....

আর যতদূর আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতের শেষভাগে আগমণকারী মসীহ্ ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্ক, ইঞ্জিলে তাদের উপমা সেই অঙ্কুরের ন্যায় যা ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে নিজের শক্ত কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়। যা দেখে সেই বীজ বপনকারী অর্থাৎ ধর্মের সেবায় অংশগ্রহণকারীরা আনন্দিত হবে। এর ফলে কাফেররা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। আর যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাদের জন্য তিনি মহান ক্ষমা এবং প্রতিদান দেওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন।

(তরজুমাতুল কুরআন, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে, পৃ: ৯২৮)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

এই আয়াতে ইঞ্জিলের অনুসারীদের তুলনায় ইসলামী অংশের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেটি হবে মহম্মদী মসীহ্র জামাত।

এই আয়াতে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মতির ১৩ অধ্যায়ের ৩-৯ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-“এক বীজবপনকারী বীজ বপন করতে বের হয়। বপন করার সময় কয়েকটি শস্যদানা পথের ধারে পড়ে যায়, যেগুলিকে পাখিরা খেয়ে ফেলে। কিছু দানা পাথুরে জমিতে পড়ে যেখানে সেগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে মাটি পায় নি। গভীর মাটি না পাওয়ার কারণে সেগুলি দ্রুত অঙ্কুরিত হলেও, সূর্যের তাপে পুড়ে যায় আর শিকড় না থাকায় শুকিয়ে যায়। কিছু দানা ঝোপঝাড়ে পড়ে যায়। আগাছা বেড়ে সেগুলিকে দমিয়ে দেয় আর কিছু দানা উর্বর জমিতে পড়ে এবং সেগুলিতে ফল ধরে, কিছু দানা একশ গুণ পর্যন্ত, কিছু ষাট গুণ পর্যন্ত আর কিছু ত্রিশ গুণ পর্যন্ত ফল দেয়।

কুরআন মজীদের এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ায় আগমণকারী মসীহ্র অনুসারীরাও অনুরূপ হবে যেন তারা উত্তম জমিতে বপিত শস্যদানা। আল্লাহ্ তা’লা এতে এত বরকত দান করবেন যে এক একটি দানা ষাট গুণ থেকে একশ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হবে। কিন্তু এটি আকস্মিকভাবে ঘটবে না, বরং ধাপে ধাপে হবে।

* * *

সন্তানের প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শের আলোকে

মূল রচনা : নিয়ায আহমদ নায়েক, অনুবাদ মহম্মদ সালাহুদ্দীন (মুয়াল্লিম সিলসিলা)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب:22)

অনুবাদ : নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে।

(সূরা আহযাব, আয়াত: ২২)

আঁ হযরত (সা.) যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে যুগ প্রত্যেক দিক থেকে অন্ধকারময় যুগ ছিল সন্তানদের শিক্ষার দিক দিয়ে আরব জাতি অনগ্রসর ছিল। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ শাস্তিযোগ্য ছিল। অনেক গোত্রের মধ্যে কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত পুঁতে ফেলা হত। আর শিশু সন্তানদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা হত। সুতরাং, একবার এক আরবী ইকরা বিন হাবিস আঁ হযরত (সা.) কে বাচ্চাদের স্নেহ করতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাচ্চাদের চুমু দাও ও তাদেরকে ভালবাস। পুত্র সন্তানদের এজন্য পছন্দ করা হত যে, তারা বড় হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জাতির গৌরবের কারণ হবে। তাদের নামকরণও যুদ্ধ সংক্রান্ত শব্দ দিয়ে করা হত। হযরত আলি (রা.) ঘরে প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম হলে তার নাম রাখা হয় 'হারব', যার অর্থ যুদ্ধ। আঁ হযরত (সা.) বিষয়টি জানতে পেরে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এবং হারব' পরিবর্তন করে তার নাম রাখেন হাসান।

এই অর্থে আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব সন্তানদের লালন-পালনের প্রসঙ্গেও রহমতের কারণ হয়েছে। সন্তানের লালন পালনের বিষয়ে তিনি যে পথপ্রদর্শক নীতি প্রণয়ন করেছেন, যা কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখতে পাই। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেটিকে বর্ণনা করা অসাধ্য সাধনের চেষ্টা বৈ কিছুই নয়। সংক্ষেপে সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটির কথা উল্লেখ করব।

আঁ হযরত (সা.) সন্তানদের লালন পালনের ক্ষেত্রে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা কুরআন করীমের শিক্ষামালার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হযরত আয়েশার উক্তি অনুসারে 'কানা খুলকুহুল কুরআন' ছিল তাঁর বাস্তবিক চিত্র। সন্তানের লালন পালন সম্পর্কে কুরআন করীমে যে শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে, তার উপর তিনি (সা.) অনুশীলন করে দেখিয়েছেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে আমরা জানতে পারি যে, সন্তানের প্রশিক্ষন বা প্রতিপালনের কাজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই আরম্ভ হয়ে যায়। এই কারণে তিনি (সা.) বলেছেন, বিবাহের জন্য পুণ্যবতী ও স্নেহশীলা নারী পছন্দ করো। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করে যে, হুযুর কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে।' এর উত্তরে হুযুর (সা.) বললেন, 'এর জন্য তোমার কি প্রস্তুতি রয়েছে?' এর থেকে আমরা জানতে পারি, যে কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার চেয়ে তার প্রস্তুতিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপভাবে বিবাহের থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পাত্রী সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া এবং তা নির্বাচন করা। এটি হল অট্টালিকা নির্মাণের প্রথম ইঁট স্বরূপ। এটি সঠিক থাকলে পুরো বংশপরম্পরা সঠিক থাকবে। আর এটিই যদি বাঁকাভাবে স্থাপন করা হয়, তবে গোট নির্মাণটিও বাঁকা থেকে যাবে।

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, শিশু গর্ভাবস্থায় থাকাকালীনই তার প্রশিক্ষন ও যত্ন নেওয়ার বিষয়ে সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। এবিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, এই সময় গর্ভস্থ শিশু মায়ের প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল বলেন, 'আমার ছেলে আব্দুল হাঈ যখন মায়ের গর্ভে ছিল, সেই সময় আমি স্ত্রীকে বললাম, এই সময়টুকু তুমি পড়ালেখার প্রতি বেশি মনোযোগ দাও। আব্দুল হাঈ জন্ম নেওয়ার পর পড়ালেখার প্রতিই তার আগ্রহ বেশি ছিল। শৈশবে তার সামনে একবার একটি কলম ও সিকি রেখে দেওয়া হয়, সে কলমই হাতে তুলে নেয়। এটি একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা ছিল। একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, 'আমাকে সন্তানের প্রশিক্ষনের জন্য কোন উপদেশ দিন।' তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার শিশুর বয়স কত?' সে উত্তর দিল, 'এক বছর।' রসূল করীম (সা.) বললেন,'আপনি শিশুর প্রশিক্ষনের ব্যাপারে বিলম্ব করে ফেলেছেন।' মহানবী (সা.)-এর এই উক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, নবজাতকদের প্রশিক্ষন কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়। এই কারণে আঁ হযরত (সা.) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সর্বপ্রথম বাচ্চার কানে আযান দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। অতঃপর তরবীয়তি বিষয়ের সূক্ষ্ম দিকগুলির কথা বর্ণনা করে তিনি (সা.) বলেছেন, 'শিশুদের সর্ব প্রথম যে কথাটি শেখানো উচিত সেটি হল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।' এর থেকে বোঝা যায় তিনি বলছেন, শিশুর কানে সর্ব প্রথম পাঠ যেটি পৌঁছনো উচিত সেটি হল খোদার মহত্ব। আর সর্ব প্রথম যে পাঠ তার শেখা উচিত আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা উচিত, সেটিও যেন খোদার মহত্ব, তাঁর একত্ববাদ এবং ভালবাসার পাঠ হয়।' তিনি (সা.) নিজের নাতীদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। একবার তাঁকে সেই নাতিরা জিজ্ঞাসা করে যে, আপনি আমাদেরকেও ভালবাসেন আবার খোদা তা'লাকেও ভালবাসেন। একই সময়ে এই দুটি জিনিসকে কিভাবে ভালবাসা সম্ভব। আঁ হযরত (সা.) তখন উত্তর দিলেন, যখন তোমাদের আর খোদার ভালবাসার মধ্যে তুলনা হবে, সেই সময় খোদার ভালবাসাই বিজয়ী হবে।

তিনি (সা.) বলেছেন, শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা করা এবং নামকরণ করা উচিত। সে যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন তাকে নামাযের আদেশ করুন। আর যখন দশ বছরে উপনীত হয়, তখন নামায না পড়লে তাকে সতর্ক করে শাস্তিও দাও, তার বিছানা পৃথক করে দাও। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেছেন ১২, ১৩ কিম্বা ১৪ বছরে পৌছালে দোয়ার মাধ্যমে সন্তানের তরবীয়ত কর, কেননা এর পর যদি কঠোরতা দেখাও তবে ছেলে অবাধ্য হয়ে পড়বে।

সন্তানের তরবীয়তের বিষয়ে আঁ হযরত (সা.) একটি পথপ্রদর্শক নীতি বানিয়েছেন। সেই নীতিটি হল, ; শিশুদেরকে সম্মান দাও এবং তাদেরকে উন্নত আচরণ ও অভ্যাস শেখাও। শিশুদেরকে সম্মান দেওয়ার মধ্যে তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় কথায় নম্রতা ও মিষ্টতাও সম্মান দেওয়ার মধ্যে পড়ে। কুরআন করীমে একাধিক স্থানে এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে আম্বিয়াগণ নিজেদের সন্তানদেরকে 'হে আমার পুত্র বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। কথপোকথনের এই ভঙ্গি অত্যন্ত সুন্দর ও স্নেহপূর্ণ। পক্ষান্তরে বাচ্চাদের সঙ্গে কঠোরতাপূর্ণ আচরণ করা হয় তবে তাদের ক্ষেত্রেও- 'প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে'- নিউটনের এই গতিসূত্রের মতই তারাও কঠোরতার সঙ্গে উত্তর দিতে পারে। প্রচলিত প্রবাদে বলা হয় যে, যদি মিষ্টি ভাষা দিয়ে দেশ শাসন করা যেতে পারে, তবে নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রে এই কৌশল কেনই বা সফল হবে না।

আঁ হযরত (সা.) বাচ্চাদেরকে যাবতীয় প্রকারের শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। যেমন- পানাহারের পদ্ধতি, বাড়িতে প্রবেশ করার পদ্ধতি, বৈঠকে যাওয়ার রীতি নীতি এবং পথ চলার রীতিনীতি আরও অনেক কিছু। মহানবী (সা.) বাচ্চাদেরকে সালাম করতেন। আর তিনি প্রথমে সালাম করতেন। তাঁর নির্দেশ হল সালামকে প্রচলন দাও,ে কেননা, এটি পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতির মাধ্যম। আমাদের বাচ্চারা যদি তা মেনে চলে, তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি তৈরী হবে। সচরাচর দেখা যায় বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে আর এক্ষেত্রে অনেক সময় বাচ্চার পরিবারও জড়িয়ে পড়ে। সালামের রীতি অবলম্বন করলে, এই ঝগড়া বিবাদ কমে যাবে। আর খোদা না করুক, কখনও হলেও শীঘ্রই তার মীমাংসাও হয়ে যাবে।

হযরত উমর বিন সালামা বলেন, আমি আঁ হযরত (সা.)-এর অভিভাবকত্বে ছিলাম। খাওয়ার সময় আমি পাত্রে নিজের হাত এদিক ওদিকে ঘোরাচ্ছিলাম। তা দেখে আঁ হযরত (সা.) আমাকে বললেন, হে বৎস! খোদার নাম নিয়ে খাও আর ডান হাত দিয়ে সামনের অংশ থেকে খাও। খাওয়ার বিষয়ে এই ঘটনাটিকে দৃষ্ঠিপটে রাখা আবশ্যক। আমরা অনেক সময় মনে করে থাকি যে, বাচ্চাদের যে কোন উপায়ে খাওয়াতে পারলেই হল। কিন্তু মহম্মদী আদর্শ অবলম্বন করলে তবেই আমাদের সন্তানদের সঠিক তরবীয়তএবং তাদের সফলতার নিশ্চয়তা দিতে পারে।

তাঁর সন্তান প্রতিপালন ও তরবীয়তের পদ্ধতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি বাচ্চাদের পৃথকভাবে তরবীয়ত করতেন, কেবল এটুকুই নয়, বরং তাদেরকে নিজের বৈঠকেও নিয়ে যেতেন। হযরত আনাসা বিন মালেক (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত ইবনে উমরের মত সম্মানীয় সাহাবাগণ এই সব বৈঠকেরই ফসল।

এমনই এক বৈঠকের ঘটনা যেখানে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমরও উপস্থিত ছিলেন। আঁ হযরত (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, ' একটি বৃক্ষ রয়েছে যেটি চিরশ্যামল থাকে। উপকারের দিক থেকে সেটি মুসলমানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সেটি কোন বৃক্ষ?' সাহাবাগণ জঙ্গলের বিভিন্ন বৃক্ষ-লতার নাম করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, যিনি সেই বৈঠকের সব থেকে কম বয়সের বালক ছিলেন, তিনি বলেন, আমার একবার মনে হল হয়তো সেটি খেজুরের গাছ। কিন্তু আমি যখন দেখলাম হযরত আবু বাকার এবং হযরত উমরের মত ব্যক্তিও নীরবে বসে আছেন, তখন আমি সংকোচ করে চুপ করে থাকলাম। তিনি (সা.) বললেন, এটি হল খেজুরের গাছ। পরে আমি নিজের পিতা হযরত উমর (রা.)কে একথা বললে তিনি বললেন, একথা যদি তুমি বলতে পারতে, তবে আমার জন্য এই সম্মান লাল উটের থেকেও শ্রেয় হত।

এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, বাচ্চাদেরকে আমাদের মজলিসে নিয়ে আসা উচিত এবং তাদেরকে জ্ঞানমূলক ও শিষ্টতামূলক বৈঠকের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে তাদের বোধশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা প্রখর হয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তফসীরে কবীরে এক স্থানে বলেন, মুগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হল, তারা রাজপুত্রদেরকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড থেকে অনবহিত রাখতে আরম্ভ করেছিল। বরং তারা নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জীবনে নিমজ্জিত ছিল। এই কারণে যখনই রাজ্যের উপর কোন বিপদ এসেছে তারা সেটিকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই সন্তানদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করতে হলে তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে বসানো এবং কথোপকথন ও পরামর্শে সামিল করা বাঞ্ছনীয়।

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'কেশসমূহের সম্মান কর।' এর দ্বারা এও বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে জেষ্ঠদের সম্মান কর। অতএব, আমাদের বাচ্চাদেরকে বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখাতে হবে। বড়দের সম্মান ও শ্রদ্ধা করার মধ্যে মহত্ব ও সফলতার এক রহস্য লুকিয়ে আছে।

সন্তানের তরবীয়ত প্রসঙ্গে তিনি (সা.) যে জরুরী বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন সেটি হল, বাচ্চাদেরকে মিথ্যা থেকে দূরে রাখতে হবে। পিতামাতা নিজেরাও যেন সমস্ত পাপের মূল এই মিথ্যা থেকে বিরত থাকে আর সন্তানদেরকেও যথাসাধ্য এর থেকে বিরত রাখা উচিত। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমির বর্ণনা করেন, 'আমার মা আমাকে একবার বলেছিলেন, আমার কাছে এস তোমাকে একটি জিনিস দিব।' সেই সময় রসুল করীম (সা.) আমাদের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার মাকে বললেন, যদি সে এসে যায় তবে তুমি তাকে কি দিতে চাইছিলে? আমার মা উত্তর দিলেন, আমি তাকে একটি খেজুর দিতে চাইছিলাম। একথা শুনে রসুল করীম (সা.) বললেন, যদি তুমি তাকে ডেকে কিছু না দিতে, তবে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা লেখা হত। এই ধরণের মিথ্যাকে অনেক সময় মিথ্যার মধ্যে গণ্য করা হয় না। যখন শিশুকে আয়ত্বে আনা যাচ্ছে না, তখন এই ধরণের প্রতারণা বাচ্চাদের সঙ্গে পিতামাতারা সচরাচর করে থাকে। এই পদ্ধতি তাদেরকে মিথ্যা বলতে উৎসাহিত করে। অপরদিকে পিতামাতার আমলনামাতেও একটি মিথ্যা যুক্ত হতে থাকে।

অনুরূপভাবে বাচ্চাদের তরবীয়ত প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সা.) -এর আদর্শ ছিল, বাচ্চাদেরকে বিশ্বস্ত ও সাধু বানানো উচিত। একবার হযরত হাসান (রা.) সদকার খেজুরের মধ্য থেকে একটি খেজুর মুখে পুরে নেন। আঁ হযরত (সা.) সেটি মুখ থেকে বার করে নেন। এটি বিশ্বস্ততার দাবি ছিল আর এর দ্বারা জাতীয় সম্পদ ও বিষয়কে রক্ষা করা এবং সেগুলি আত্মসাৎ করা থেকে বিরত থাকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। আজ যদি এই আদর্শকে আমরা মেনে চলি, তবে দুর্নীতি থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, যা সমগ্র বিশ্বকে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনীতিকে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

বাচ্চাদের তরবীয়তের জন্য একটি কার্যকরী উপায় হিসেবে তিনি (সা.) বলেছেন, বাচ্চাদের জন্য যেন দোয়া করা হয়। দোয়ার গুরুত্ব এবং কল্যাণ এক পৃথক ও অতি ব্যাপক বিষয়। এ সম্পর্কে কেবল এতটুকু বলা সমীচীন মনে করছি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন- যদি মৃত ব্যক্তি জীবন লাভ করে, তবে তা একমাত্র দোয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। দোয়ার কল্যাণে শুষ্ক শাখা সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই, সন্তানকে চিরশ্যামল ও জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ রাখতে হলে তাদের পক্ষে দোয়া করা উচিত। তিনি (সা.) বলেছেন, সন্তানের জন্য পিতার দোয়া গৃহীত দোয়া। তিনি (সা.) নিজে বলতেন, আমি আমার পিতা ইব্রাহিমের দোয়ার ফল। তিনি (সা.) নিজের নাতিদেরকে, হাসান ও হোসেনকে কোলে বসিয়ে আদর করতেন এবং তাদের জন্য খোদার কাছে দোয়া করতেন, 'হে খোদা আমি এদেরকে ভালবাসি, তুমিও এদেরকে ভালবাস। যাকে খোদা ভালবাসতে আরম্ভ করেন আর যে তাঁর প্রিয় ও স্নেহভাজন হয়ে ওঠে তার কিসের দুঃখ বা কিসের চিন্তা?

পিতামাতার পুণ্যের প্রভাব সন্তানদের উপরও বিন্যস্ত হতে থাকে। এই প্রভাবের ফলই সন্তান ভোগ করে। এই ধারা বংশপরম্পরায়ও চলতে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিদেরকে সাত প্রজন্ম পর্যন্ত ছাড় দেন। কুরআন করীমেও একথা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খিযর এক পতনোন্মুখ দেওয়ালকে এই কারণে রক্ষা করেন যে তাদের পিতা পুণ্যবান ছিলেন। তাঁর পুণ্যের কারণে দুইজন অনাথ শিশুর জন্য সেই দেওয়ালের নীচে এক ধনভান্ডার আল্লাহ্ তা'লা লুকিয়ে রেখেছিলেন, যাতে তারা বড় হয়ে তা থেকে খরচ করতে পারে।

সন্তানের তরবীয়তের জন্য আঁ হযরত (সা.) আরও একটি পথপ্রদর্শনকারী নীতি তৈরী করেছিলেন। আর সেটি হল কৈফিয়ত তলব করা। যেরূপ তিনি বলেছেন- 'তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে নিগরান আর প্রত্যেক নিগরানকে তার নিগরানী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। একজন পিতার উপর কেবল নিজের দায়িত্বই বর্তায় না, বরং নিজ পরিবার ও সন্তানসন্ততির দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত। তাদেরকেও তাকে জাহান্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আকবার ইলাহিবাদি ব্যঙ্গাত্মক রূপে একটি বাস্তব থেকে পর্দা উন্মোচন করেছেন। তিনি পদ্যের আকারে বলেছেন-

কালকে কিছু পর্দাহীন নারী চোখে পড়তেই জাতির আত্মাভিমান জেগে উঠল, তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল তোমাদের পর্দার কি হল, তারা উত্তর দিল, সেই পর্দা পুরুষদের বুদ্ধি ঢাকার কাজে আসছে।

পুরুষদের তত্ত্ববধায়ক বা নিগরান হওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি লাভের পরিণামে পরিবারে মানুষ তরবীয়ত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই প্রসঙ্গে নিজেদের দায়িত্বাবলী অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন।

ছোটদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর কৃপা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণের অজস্র ঘটনা রয়েছে। প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যেই রয়েছে অশেষ প্রজ্ঞা ও দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ। আমাদের সেগুলিকে পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং নিজেদের সন্তানদের তরবীয়তের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। আবু উমের নামে এক বালক একটি পাখি পোষ্য হিসেবে রেখেছিল। সেই পাখিটি মারা গেলে তিনি (সা.) তাকে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছাড়াই সেই বালকের মর্মবেদনা দূর করে জিজ্ঞাসা করেন, ' হে আবু উমের, পাখিটির কি হল? দুই জাহানের বাদশাহ সেই বাচ্চার সঙ্গে এমন নিসংকোচে কথা বলছেন, যা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, হুযুর (সা.) বাচ্চাদের আগ্রহ ও তাদের শখের বিষয়ে যত্নবান থাকতেন। তিনি বাচ্চাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। সন্তানদের তরবীয়তের জন্য নবীর এই আদর্শটিকে অবলম্বন করা ভীষণভাবে প্রয়োজন। কেনন, ইন্টারনেট ও স্মার্ট ফোন শিশুদেরকে খেলার মাঠ থেকে দূরে করে দিয়েছে। সেই সমস্ত খেলা তারা এখন স্মার্ট ফোন এবং ট্যাবেই খেলে। যার ফলে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে আর স্বভাবে খিটখিটে ভাব আসছে। মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: বাচ্চারা যদি ২৪ ঘন্টাও খেলতে থাকে, তথাপি আমি তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হই না, কেননা, খেলার কারণে স্বাস্থ্য গঠন হয়। প্রথমত আমাদেরকে বাচ্চাদেরকে ইন্টারনেট থেকে বের করে এনে খেলার মাঠে নিয়ে আসতে হবে, আর ইন্টারনেটে বাজে অনুষ্ঠানাদির পরিবর্তে এম.টি.এর প্রতি আগ্রহ তৈরী করতে হবে। হুযর আনোয়ার বলেছেন, প্রত্যহ প্রতিটি পরিবারে কমপক্ষে এক ঘন্টা করে এম.টি এ চলা উচিত। তিনি এও বলেন, টিভির আওয়ায উঁচু রাখবেন যাতে তা বাচ্চাদের কর্ণগোচর হয়।

কথিত আছে, যেখানে ধনভাণ্ডার আছে, চোরের উৎপাত সেখানেই বেশি। কাদিয়ান দারুল আমান এক আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার। কিন্তু চোর রূপী শয়তান এখানে অধিক সক্রিয় থাকবে। সে চাইবে না, এখানকার ছেলেমেয়েরা সিরাতে মুস্তাকিম-এর পথে পরিচালিত হোক। আমরা এবং আমাদের বাচ্চারা খোদা তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং মহম্মদ (সা)-এর আদর্শ অবলম্বন করে শয়তানকে পরাস্ত করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

হুযুরের ভাষণের শেষাংশ ......

মাধ্যমে আমরা সেই জীবন্ত খোদাকে লাভ করেছি, যিনি স্বয়ং বাক্যালাপ করে আমাদেরকে নিজের অস্তিত্বের নিজেই জানান দেন এবং অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশের মাধ্যমে নিজের আদি ও অনাদি শক্তির উদ্ভাসিত চেহারা প্রকাশ করেন। অতএব আমরা এমন এক রসুলকে পেয়েছি যিনি আমাদেরকে সত্য খোদাকে দেখিয়েছেন। আমরা এমন খোদাকে পেয়েছি যিনি নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তি দ্বারা প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শক্তিমত্তার কিরূপ মহিমা যেটি ছাড়া কোন বস্তুই অস্তিত্ব লাভ করে নি। তিনি অসীম শক্তি, সৌন্দর্য এবং কৃপার অধিকারী। তিনি ছাড়া অন্য কোন খোদা নেই।

(নসীমে দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- ১৯, পৃ:৩৬৩)

আমি যা কিছু লাভ করেছি তা কেবলই আঁ হযরত (সা.)-এর কল্যাণে। এবিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:-

“আমি তাঁর কসম করে বলছি, তিনি যেমন হযরত ইব্রাহিম (আ.), ইসহাক (আ.), ইসমাঈল (আ.), ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ.) ও ঈসা (সা.)-এর মত নবীদের সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন এবং তাঁদের সবার উপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন এবং তার উপর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও পবিত্র ওহী অবতীর্ণ করেছিলেন, এমনি আমাকেও তিনি তাঁর পবিত্র বাণী দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমার এ সম্মান শুধ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ দ্বারাই লাভ হয়েছে। আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর অনুসরণ না করতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হতো, তা হলেও আমি কখনও খোদার সাথে বাক্যালাপ ও তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদী নবুওয়াত ব্যাতিরেকে অপর সমস্ত নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। নব বিধান নিয়ে কোন নবী আসতে পারে না। কিন্তু বিধান (শরিয়ত) বিহীন নবী আসতে পারেন, যদি তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগামী হন। ”

(তাজল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানীয় খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৪১১-৪১২)

অতঃপর তিনি বলেন:

“আমি আমার সত্য ও পরিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা জানি যে, ঐ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজ্ঞানুবর্তিতা ছাড়া কোন মানুষ না খোদা পর্যন্ত পৌছিতে পারে, না পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের অংশ লাভ করিতে পারে। এখানে আমি ইহাও বলিতেছি যে, উহা কোন্ বস্তু যাহা আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিতার পর সর্ব প্রথম হৃদয়ে জন্ম লাভ করে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহা সুস্থ হৃদয়। অর্থাৎ ঐ হৃদয় হইতে পৃথিবীর ভালবাসা তিরোহিত হইয়া যায় এবং উহা এক অনন্ত ও স্থায়ী স্বাদের অন্বেষণকারী হইয়া যায়। ইহার পর এই সুস্থ হৃদয়ের দরুন একটি স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ঐশী ভালবাসা অর্জিত হয়। এই সকল পুরস্কার আঁ হযরত (সা.)-এর আজ্ঞানুবর্তিতার দরুন উত্তরাধিকার রূপে পাওয়া যায় যেমন আল্লাহ্ তা’লা নিজেই বলেন,

‘তাহাদিগকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তবে আস, আমার অনুবর্তিতা কর যাহাতে খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসেন।’

(আলে ইমরান, আয়াত: ৩২)

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৬৪-৬৫)

আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসা এবং তাঁর অনুসরণ মানুষকে খোদার প্রিয়ভাজন করে তোলে। এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন-

“আল্লাহ্ তা’লা কাউকে ভালবাসার জন্য এই শর্ত রেখেছেন যে, এইরূপ ব্যক্তিকে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা করতে হবে ”

এক ব্যাক্তির আপত্তির জবাবে তিনি বলেন, “ যদি কেউ একথা বলে যে, আসল উদ্দেশ্য হল পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা, তবে নাজাতপ্রাপ্ত ও গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভের জন্য অনুবর্তিতা করার আবশ্যকতা কি? এর উত্তর হল, পুণ্যকর্ম সম্পাদিত হওয়ার খোদা তা’লা প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থের উপর নির্ভরশীল। অতএব, আল্লাহ্ তা’লা যখন একজন মনোনীত ব্যক্তিকে মহাপ্রজ্ঞার অধীনে ইমাম ও রসুল হিসেবে নিযুক্ত করে তাঁর অনুবর্তিতার করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে যে ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করে, তাকে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের তৌফিক দেওয়া হয় না।” বিনা ব্যতিক্রমে আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আজ্ঞানুবর্তিতা করা আবশ্যক। কেবল কর্ম উপকারে আসে না। সর্বোপরি আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা আবশ্যক।

তিনি বলেন,

“বস্তুত: আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, আঁ হযরত (সা.)-এর খাঁটি অন্তকরণে অনুবর্তিতা ও তাঁহার প্রতি ভালবাসা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় বানাইয়া দেয়। ইহা এইভাবে হয় যে, এইরূপ অবস্থায় তাহার নিজের হৃদয়ে খোদা প্রেমের একটি দহন সৃষ্টি হয়। তখন এইরূপ ব্যক্তি সব কিছু হইতে নির্লিপ্ত হইয়া খোদা -প্রেমের একটি বিশেষ বিকাশ হয় এবং খোদা তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় প্রেম ও ভালবাসার রঙ দান করিয়া আবেগের শক্তিসহ নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। তখন সে প্রবৃত্তির আবেগের উপর জয়লাভ করে এবং তাহার সাহায্য ও সমর্থনে সবদিক হইতে খোদা তা’লার অলৌকিক ক্রিয়া নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়।”

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৬৭-৬৮)

তিনি পুনরায় বলেন-

‘মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্ আঁ হযরত (সা.)কে খাতামের অধিকারী বানাইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাকে পরিপূর্ণ আশিসের জন্য মোহর দেওয়া হয় যাহা আর কোন নবীকে কখনও দেওয়া হয় নাই। এই কারণেই তাঁহার নাম খাতামুন্নাবীঈন সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার পরিপূর্ণ অনুবর্তিতা নবুয়্যত দান করে এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোনিবেশ নবী সৃষ্টিকারী হয়। এই পবিত্রকরণ শক্তি অন্য কোন নবী পান নাই। ইহাই ‘উলেমাও উম্মাতি কা আম্বিয়ায়ে বানী ইসরাঈল’ হাদীসটির অর্থ। অর্থাৎ আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের তুল্য হইবেন। যদিও বনী ইসরাইলদের মধ্যে অনেক নবী আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের নবুয়্যত মূসার অনুবর্তিতার ফল ছিল না। বরং ঐ সকল নবুয়্যত ছিল সরাসরি খোদার দান। ইহাতে হযরত মূসার অনুবর্তিতার এক বিন্দুও অংশ ছিল না।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ১০০)

তাই এখন আমি উলেমাদের উদ্দেশ্যে বলছি, হে নামধারী উলেমাগণ! চিন্তা করে দেখ, আঁ হযরত (সা.)কে সত্তাকে নবীর কষ্টিপাথরের মর্যাদা দিলে তাঁর সম্মান বাড়ে নাকি খাটো হয়? কিন্তু তোমরা এবিষয়ে চিন্তা করবে না, কারণ এতে জাগতিক স্বার্থ প্রভাবিত হয়। কিন্তু আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, আঁ হযরত (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মানের যে ব্যুৎপত্তি আমাদের লাভ হয়েছে তা একমাত্র হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণেই। অতএব প্রত্যেক আহমদীর বিশেষভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর সালাম ও দরুদ প্রেরণকে নিজেদের জন্য অনিবার্য করা উচিত যাতে আমরা সেই সমস্ত কল্যাণরাজি থেকে উপকৃত হতে পারি যা তাঁর পবিত্র সত্তার সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্কস্থাপনকারীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর উপর দরুদ প্রেরণের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন:

“ আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সত্যতা ও বিশ্বস্ততার নমুনা দেখুন। তিনি প্রত্যেক প্রকারের কুমন্ত্রণার মোকাবেলা করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের বিপদাপদ এবং কষ্ট সহন করেছেন, বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। এই সত্যতা ও বিশ্বস্ততার কারণেই আল্লাহ্র কৃপা তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন-

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى
النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (سورة الاحزاب: 57)

(আহযাব, আয়াত: ৫৭) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা এবং তাঁর সমস্ত ফিরিসতারা রসুলের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবীর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর।”

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, রসুলে আকরম (সা.)-এর কর্মধারা এমন ছিল যে, আল্লাহ্ তা’লা তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীকে সীমাবদ্ধ করতে কোন বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করেন নি।” সীমিত করেন নি। “ শব্দ পাওয়া যেত, কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং প্রয়োগ করেন নি। অর্থাৎ তাঁর পুণ্যকর্মের প্রশংসা সীমার বাইরে ছিল। ” আল্লাহ্ তা’লা এর কোন সীমা বেঁধে দিতে চান নি। “ এই প্রকারে আয়াত অন্য কোন নবীর সম্মানে তিনি প্রয়োগ করেন নি।” তিনি বলেন, “ তাঁর অন্তরে সেই সত্যতা ও বিশ্বস্ততা ছিল এবং তাঁর কর্মগুলি খোদার দৃষ্টিতে এতটাই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা’লা চিরকালের জন্য এই আদেশ দিলেন- ভবিষ্যতে

কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করবে।”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭-৩৮)

দরুদ শরীফ কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করা উচিত তা স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

“ দরুদ শরীফ এই উদ্দেশ্যে পাঠ করা উচিত যাতে খোদাবন্দ করীম স্বীয় পূর্ণ কল্যাণরাজি তাঁর নবী করীম (সা.)-এর উপর নাযেল করেন এবং তা সমগ্র জগতের জন্য কল্যাণের উৎস বানিয়ে দেন এবং ইহকাল ও পরকালে তাঁর সম্মান ও বৈভবকে প্রকাশ করে দেন। এই দোয়া পূর্ণ আবেগ ও উচ্ছ্বাস সহকারে হওয়া উচিত। ” অর্থাৎ আন্তরিক আবেগ সহকারে হওয়া উচিত। “ যেভাবে কোন ব্যক্তি নিজের বিপদের সময় পূর্ণ আবেগ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে দোয়া করে। ” বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দোয়া করে, “বরং এর চেয়েও বেশি অনুনয় বিনয় এবং কাতর প্রার্থনা করা উচিত। আর প্রতিদান বা সম্মান পাব কিনা এমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব রাখা উচিত নয়। বরং কেবল এই উদ্দেশ্য থাকা উচিত যে, পূর্ণ ঐশী কল্যাণসমূহ যেন হযরত রসুল মকবুল-এর উপর নাযেল হয় এবং তাঁর প্রতাপ ইহকাল ও পরকালে উদ্ভাসিত থাকে। আর এই উদ্দেশ্যে ধৈর্য ও উদ্যম প্রয়োজন আর দিবারাত্রি নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ চাই। এমনকি মনের মধ্যে এটি ভিন্ন অন্য কোন বাসনা অবশিষ্ট না থাকে।”

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খ-, পৃ: ৫২৩, মীর আব্বাস আলির নামে পত্র, পত্র সংখ্যা-১০)

দরুদ শরীফ পাঠ করার উপদেশ দান করতে গিয়ে তিনি বলেন-

“ সমধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ কর। কিন্তু কেবল প্রথা ও অভ্যাসগতভাবে নয়, বরং রসুল করীম (সা.)-এর সৌন্দর্য ও অনুগ্রহকে দৃষ্টিপটে রেখে এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান লাভ এবং সফলতার জন্য (দরুদ পাঠ কর)।

(মালফুযাত, ৯ম খ-, পৃ: ২৩)

তাঁর সফলতা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? পৃথিবীতে প্রকৃত ইসলামের বিস্তার লাভ, প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং ইসলামের নামে আজকাল যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান ঘটানো। অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য হল নিজের উপর সেই অবস্থা তৈরী করে নেওয়া এবং এমনভাবে দোয়া করা ও দরুদ প্রেরণ করা। পৃথিবী থেকে যাবতীয় অরাজকতা ও অনিষ্ট দূর করা এটিই আমাদের কাছে একমাত্র উপায়।

অন্যত্র তিনি (আ.) তাঁর এক শিষ্যকে দরুদ পাঠের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন-

“ দরুদ শরীফ পাঠের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হন। যেরূপে কোন ব্যক্তি নিজের প্রিয়জনের জন্য প্রকৃত কল্যাণ কামনা করে, অনুরূপ নিষ্ঠা ও ভালবাসা নিয়ে হযরত নবী করীম (সা.)-এর জন্য আকুলভাবে বরকত প্রার্থনা করে আর সেই অনুনয় বিনয়ে কোন প্রকার কৃত্রিমতা না থাকে, বরং তাঁর প্রতি প্রকৃত বন্ধুত্ব, ভালবাসা থাকে আর সত্যিকার আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর জন্য সেই কল্যাণ কামনা করা হয় যা দরুদ শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে.... আর ব্যক্তিগত ভালবাসার লক্ষণ হল মানুষ কখনও ক্লান্ত ও পরিশ্রান্তও হয় না আর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থও তাতে জড়িত থাকে না। এবং আঁ হযরত (সা.) -এর উপর যেন খোদা তা'লার বরকত নাযেল হয়, কেবল এই উদ্দেশ্যেই পাঠ করে।

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খ-, পৃ: ৫৩৪-৫৩৫)

দরুদ শরীফ পাঠ করার মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা সম্পর্কে একস্থানে তিনি বলেন -

“ যদিও আঁ হযরত (সা.)এর কারোর দোয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর মধ্যে এক গভীর রহস্য রয়েছে। যে ব্যক্তিগত ভালবাসা নিয়ে কারো জন্য কৃপা ও কল্যাণ কামনা করে, সে তার সেই ব্যক্তিগত ভালবাসার দরুন সেই ব্যক্তির সত্তার একটি অংশে পরিণত হয়। আর যেহেতু আঁ হযরত (সা.)-এর উপর আল্লাহ্‌র অশেষ কল্যাণ রয়েছে এই কারণে দরুদ প্রেরণকারীদের মধ্য থেকে যারা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসার বশবর্তী হয়ে তাঁর জন্য কল্যাণ কামনা করে, তারা নিজেরাও অশেষ কল্যাণরাজি থেকে নিজ নিজ আবেগ ও উচ্ছ্বাস অনুপাতে অংশ পায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা ও ব্যক্তিগত ভালবাসা ছাড়া এই কল্যাণ অত্যন্ত কম পরিমাণে প্রকাশ পায়।

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খ-, পৃ: ৫৩৫, মীর আব্বাস আলি সাহেবের নামে পত্র, পত্র নং-১৮)

অতএব নিতান্তই ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস ও ভালবাসার আবেগ নিয়ে দরুদ প্রেরণ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা দরুদ পাঠ করার বিষয়ে আমাদের মধ্যে সেই আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন আর আমরা যেন প্রকৃত অর্থে আঁ হযরত (সা.)-এ প্রতি দরুদ প্রেরণকারী হই আর সেই সকল সফলতা ও বিজয়ের সাক্ষী ও অংশীদার হই যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর যেগুলি আঁ হযরত (সা.)-এর প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আমরা মুসলমান কি মুসলমান নই সে বিষয়ের জন্য আমাদের কোন প্রশাসন, কোন ধর্মীয় প-িত, নামধারী ধর্মের আলেমের পক্ষ থেকে কোন প্রকার সনদ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বা কোন ফর্মের উপর লিখলে আমরা মুসলিম বা অমুসলিম হয়ে যাই না। আমাদের প্রয়োজন কেবল একটি মাত্র সনদের। আর সেটি হল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি। আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আর সেই সনদ তখনই তিনি দান করবেন যখন আমরা সত্যিকার অর্থে হযরত মহম্মদ (সা.)–এর উম্মত হওয়ার স্বার্থকতা পূর্ণ করব আর তাঁর প্রকৃত অনুসারী হব। তখন আমাদের দরুদ আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে পৌঁছে আমরাও দরুদ থেকে সেই কল্যানের ভাগী হব যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)কে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

এখন এই বছরটিও শেষ হচ্ছে। কিছু দেশে চব্বিশ ঘন্টা আর কিছু দেশে দুই দিন ও দুই রাত অবশিষ্ট আছে। বছরের শেষের এই দিনগুলিও দরুদে পরিপূর্ণ করে রাখুন আর নতুন বছরকেও দরুদ সালাম দিয়ে স্বাগত জানান যাতে আমরা যথাশীঘ্র এই সকল কল্যাণরাজি অর্জনকারী হই যা আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ ত'াল আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, প্রত্যেক বিরোধীতা থেকে আমাদের রক্ষা করুন আর তাদের অনিষ্ট তাদের প্রতিই ফিরিয়ে দিন।

এখন আমরা দোয়া করব। আমার সঙ্গে দোয়ার যোগ দিন। (দোয়া)

(দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার বলেন): আমি বলেছিলাম এই মূহুর্তে জলসা সালনা কাদিয়ানে শ্রোতার সংখ্যা প্রায় আঠারো-উনিশ হাজার। সঠিক সংখ্যা এসে গেছে। সেই তথ্য অনুসারে এই মূহুর্তে সেখানে আঠারো হাজার আটশ চৌষট্টি জন শ্রোতা উপস্থিত রয়েছেন আর আটচল্লিশটি দেশের প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এই জলসা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন আর পাকিস্তান ও বিভিন্ন দেশ থেকে যে সকল অতিথিরা এসেছেন আল্লাহ্ তাদের সকলকে নিরাপদে নিজেদের ঘরে পৌঁছে দিন। এখানে যুক্তরাজ্যে শ্রোতার সংখ্যা এই মূহুর্তে পাঁচ হাজার তিনশ পঁয়শট্টি জন। আর মহিলাদের প্রায় দুই হাজার চারশ আর পুরুষদের দুই হাজার ছয়শ। এখন কাদিয়ানের পক্ষ থেকে তাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হবে তা আরম্ভ করুন।

****

২২ পাতার শেষাংশ

আর আমি যদি তাঁর কাছে হতাম, তাঁর পা দুটি ধুয়ে দিতাম।’

এখন যদি কিছুটা সম্মান ও আত্মাভিমান অবশিষ্ট থাকে তবে হযরত ঈসার জন্য সেই যুগের কোন বাদশার পক্ষ থেকে এমন সম্মান প্রদর্শনের ঘটনা উপস্থাপন কর আর নগদ হাজার টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও। আর ইঞ্জিল থেকেই এমন ঘটনা উপস্থাপন করতে হবে,এমন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং নোংরা আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকা কোন পৃষ্ঠা থাকলে সেটিই পেশ কর। আর যদি কোন বাদশাহ বা আমীরের পক্ষ থেকে সম্ভব না হয়, কোন ছোট নবাবের সনদই উপস্থাপন কর। আর স্মরণ রেখো! তুমি কখনই পেশ করতে পারবে না। অতএব, নিজেই কথা তুলে উল্টে নিজেই অভিযুক্ত হয়ে যাওয়ার এমন আযাবও জাহান্নামের আযাব থেকে কোন অংশে কম নয়। শাবাশ! শাবাশ! শাবাশ! চমৎকার পাদ্রী।

(নুরুল কুরআন নম্বর-২, রূহানী খাযায়েন ৯ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)

আজও সৈয়্যদানা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর পবিত্র সত্তার উপর অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করার ধারা অব্যাহত রয়েছে। মুসলমানদেরও বড়ই দুর্ভাগ্য, তারাও খোদার এক সম্মানীয় নবী প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অবমাননায় একেবারে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষদের বোধ-বুদ্ধি দান করুন যারা খোদার নবীর অবমাননা করে নিজেদের ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংস করছে।

(মনসুর আহমদ মসরূর)

(সম্পাদকীয়র শেষাংশ.....)

এটি সম্পূর্ণরূপে ক্রটি মুক্ত মনে করি না। আর আইনগুলিকে প্রজ্ঞাপূর্ণ গবেষণার ভিত্তিতে রচিত বলেও বিশ্বাস করি না। বরং আইন রচনার নীতি সংখ্যগরিষ্ঠ প্রজাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়। সরকারের উপর কোন দৈববাণী অবতীর্ণ হয় না যার দরুন তারা আইনে কোন ক্রুটি করবে না। যদি এমন আইন নিরাপদই হত, তবে প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন আইন কেন তৈরী হচ্ছে? ইংল্যান্ডে মেয়েদের পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার বয়স হল ১৮ বছর। আর গ্রীষ্ম প্রধান দেশুগুলিতে মেয়েরা দ্রুত সাবালিকাত্ব অর্জন করে ফেলে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: যদি সরকারের আইনগুলি খোদার কিতাবের মত ক্রুটি মুক্ত না থাকে, তবে সেটির কথা উল্লেখ করা নির্বুদ্ধিতা বা বিদ্বেষের কারণ ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু আপনি অসহায়। সরকারের যদি নিজের আইনের উপর এত আস্থা ছিল, তবে কেন তারা সেই সব ডাক্তারদের শাস্তি দিচ্ছে না যারা সম্প্রতি ইউরোপে বিরাট গবেষণা করে জানিয়েছে যে, মেয়েরা নয় বছরে এমনকি সাত বছরের সাবালিকত্ব অর্জন করতে পারে।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পাদ্রীদেরকে একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, সরকারের আইনের উদ্ধৃতি দেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের ধর্মীয় পুস্তকের উদ্ধৃতি দেওয়া উচিত ছিল। তিনি বলেন:

“নয় বছর বয়স সম্পর্কে আপনি অভিযোগ করলেও তওরাত বা ইঞ্জিলের কোন উদ্ধৃতি দিতে পারেন নি। কেবল সরকারের আইনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা গেল, তওরাত ও ইঞ্জিলের উপর আপানার আর ঈমান নেই। অন্যথায় নয় বছরে বিবাহের জন্য বৈধ না থাকার বিষয়টি আপনি নিশ্চয় ইঞ্জিল থেকে প্রমাণ করতেন বা ইঞ্জিল থেকে প্রমাণ করা উচিত ছিল। পাদ্রী সাহেব! এটিই প্রতারণা। ইলহামি পুস্তকের বিষয়াদিতে আপনি সরকারী আইন পেশ করলেন।

আপনি যদি ইঞ্জিল থেকে প্রমাণ করতেন, তবে এতেই আপনার ঈমানের পরিচয় পাওয়া যেত। আপনি ইঞ্জিলকে ধাক্কা দিয়েছেন। সেখানে কাজ হাসিল না হওয়ায় সরকারের পায়ে ধরছেন। স্মরণ রাখবেন, এই গালিগুলি শুধুমাত্র শয়তানের প্ররোচনায় বিদ্বেষের কারণে। পবিত্র নবী (সা.) সম্পর্কে ব্যাভিচার ও পাপাচারিতার অপবাদ দেওয়া শয়তানের কাজ। এই দুই পবিত্র নবী, অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর কিছু বদজাত নোংরা প্রকৃতির মানুষ গুরুতর অপবাদ দিয়েছে। সেই কলুষিত হৃদয়ের অধিকারীরা প্রথমে নবী (সা.)–কে ব্যাভিচারী আখ্যা দেয়। ‘লানাতুল্লাহি আলাইহিম’। যেরূপ আপনিও এমনটি করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) কে তারা জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছিল। যেমনটি নোংরা প্রবৃত্তির ইহুদীরা করেছিল। আপনার উচিত এমন অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

আঁ হযরত (সা.) যদি ইংরেজ শাসনের অধীনে প্রজা হতেন তবে শাস্তি পেতেন। নাউযুবিল্লাহ। পাদ্রী সাহেবের এমন অপবাদের উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাকে এমন আক্রমণাত্মক উত্তর দিয়েছেন যা শুনে নিশ্চয় সে হতাশ হয়ে পড়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: যদি আপনার মতে সরকারের আইন যাবতীয় ভুল ক্রুটি থেকে মুক্ত হয়, আর এটি ঐশীগ্রন্থের সমকক্ষ হয়, বরং তার থেকে উত্তম হয়, তবে আমি আপানাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, যে সকল নবী, ইংরেজ সরকারের আইনের বিপরীতে, কয়েক লক্ষ দুগ্ধপায়ী শিশুকে হত্যা করেছে, তারা যদি এই সময়ে থাকতেন, তবে সরকার তাদের সাথে কি আচরণ করত?

যদি সেই সব মানুষ সরকারের সামনে পেশ হয় যারা অপরের ক্ষেত থেকে ফল পেড়ে খেয়েছিল, তবে সরকার তাদেরকে এবং তাদেরকে অনুমতি প্রদানকারীদের জন্য কি শাস্তি নির্ধারণ করবে।

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, সেই ব্যক্তি যে কিনা আঞ্জির ফল খাওয়ার জন্য দৌড়ে গিয়েছিল, আর ইঞ্জিল থেকে প্রমাণ হয় যে, সেই আঞ্জির বৃক্ষটির মালিকানা তার ছিল না, সেটি অপরের সম্পদ ছিল, সেই ব্যক্তি সরকারের সামনে যদি এমন আচরণ করত, সরকার তাকে কি শাস্তি দিত?

ইঞ্জিল থেকে প্রমাণ হয় যে, অনেকগুলি শূকর, যেগুলি অপরের সম্পদ ছিল, পাদ্রী ক্লার্কের কথা মত যাদের সংখ্যা দুই হাজার ছিল, মসীহ সেগুলিকে হত্যা করেন। এখন আপনিই বলুন, অপরাধের দৃষ্টিকোণ থেকে এর শাস্তি কি? আপাতত এতটুকু লেখায় যথেষ্ট। উত্তর অবশ্যই দিবেন,যাতে আরও অনেক প্রশ্ন করা যায়।

পাদ্রী সাহেব আপনার প্রশ্ন হল, আঁ হযরত (সা.)-এর মত ব্যক্তি যদি ইংরেজদের যুগে থাকতেন,তবে সরকার তার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করত? আপনার কাছে স্পষ্ট থাকে যে, যদি সেই দু জাহানের বাদশাহ এই সরকারের যুগে থাকতেন, তবে এই সৌভাগ্যবান সরকার তাঁর আনুগত্য করা গর্বের বিষয় মনে করত। যেরূপ রোমের বাদশাহ কেবল ছবি দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। আপনার দুর্ভাগ্য যে, আপনি এই সরকারের বিষয়ে এমন কুধারণা পোষণ করেন যে, তারা খোদার পবিত্র নবী রসূলদের শত্রু। এই সরকার এই যুগে ছোট ছোট মুসলমান আমীরেরও সম্মান করে। দেখ, নাসরুল্লাহ্ খান যে তাঁর ভৃত্যের মত মর্যাদাও রাখে না, আমাদের হিন্দুস্তানের কায়সার তার প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করল। সেই মহা সম্মানিত ব্যক্তি ও পবিত্র সত্তা ইহজগতেও কিরূপ সম্মানের অধিকারী ছিলেন যে, বাদশাহরা তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ত। তিনি যদি এই সময়ে হতেন তবে এই সরকার তাঁর কাছে নিজেকে সেবক হিসেবে উপস্থাপন করত। ঐশী রাজত্বের সামনে মানুষের রাজত্বকে নতি স্বীকার করতেই হয়েছে। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগের খৃষ্টান সম্রাট কায়সার জনপ্রিয়তার নিরিখে কোন অংশে কম ছিল ন। সেই সম্রাট নিজেই বলেন, আজ যদি সেই আযিমুশ শান নবীর সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য আমার হত, তবে আমি তাঁর পা ধুয়ে দিতাম। অতএব রোমের বাদশাহ্ যে কথা বলল, সেই সৌভাগ্যশালী সরকারও ঠিক একই কথা বলত। বরং এর থেকে বেশি বলত। হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কে আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, সেই যুগের কোন ছোট জমিদারও এমন কথা বলেছে যা রোমের বাদশাহ আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে বলেছিল, যে ঘটনা আজ পর্যন্ত সঠিক ইতিহাস ও সহীহ্ হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে, তবে আমি আপনাকে এখনই নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দিব। আর যদি এর প্রমাণ দিতে না পারেন, তবে সেই লাঞ্ছনাদায়ক জীবনের থেকে মৃত্যু শ্রেয়, কেননা আমি প্রমাণ করেছি যে, রোমের বাদশা এই সরকারের সমকক্ষ ছিল, বরং ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেই যুগে পৃথিবীতে তার তুল্য শক্তি কারো ছিল না। আমাদের সরকার সেই পর্যায়ে পৌঁছায় নি। তথাপি কয়সার বাদশাহ এমন সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও হতাশার সূরে বলছে, ‘আমি যদি সেই মহান ব্যক্তির সমীপে পৌছতে পারতাম, তবে তাঁর চরণদুটি ধুয়ে দিতাম।’ এই সরকার কি এর থেকে কোন অংশ নিত না? আমি দাবির সঙ্গে বলতে পারি, অবশ্যই এই সরকারও এমন সম্রাটের চরণে লুটিয়ে পড়াকে নিজের জন্য গর্বের কারণ মনে করত, কেননা এই সকরকার সেই আসমানী বাদশাহর অস্বাকীকারকারী নয় যাঁর শক্তির সামনে মানুষ এক মৃত কীটের তুল্যও নয়। আর আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শুনেছি যে, আমাদের ভারতের কায়সার বস্তুত ইসলামকে ভালবাসেন এবং তাঁর অন্তরে আঁ হযরত (সা.) প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে। অতএব, যোগ্যদের মর্যাদা ও সম্মানদানকারী এমন সরকারকেও আপনারা যে একজন নিকৃষ্ট ও দুর্বৃত্তপরায়ন পাদ্রীর মত মনে করেন তা অত্যন্ত অন্যায় কাজ। খোদা তা’লা যাদেরকে রাজত্ব এবং সম্পদ দান করেন তাদেরকে বুদ্ধিও দান করেন। তবে যদি এই প্রশ্ন ওঠে যে, কোন ব্যক্তি যদি এই সরকারের রাজত্বে হইচই বাধায় যে, আমি খোদা বা খোদার পুত্র, সেক্ষেত্রে সরকার তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করত? এর উত্তর হল, এই কৃপালু সরকার তাকে কোন চিকিৎসকের হাতে তুলে দিত যাতে তার মানসিক রোগের চিকিৎসা হয়। কিম্বা সেই বড় ঘরটিতে সুরক্ষিত রাখত, যেমন লাহোরে এমনই একটি ঘরে এই ধরণের অনেক মানুষ একত্রিত আছে।

যদি একথা বল যে, পুস্তকে লেখা আছে রোমের কায়সার বাসনা ব্যক্ত করেন যে, যদি আমি পবিত্র নবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছতে পারতাম তবে আমি তাঁর এক তুচ্ছ সেবক হিসেবে চরণদুটি ধুয়ে দিতাম। এর উত্তরে আল্লাহর কিতাবের পর সব থেকে সঠিক গ্রন্থ বুখারী একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। চোখ খুলে পড়। ‘একথা আমি নিশ্চয় জানতাম যে, শেষ যুগের নবীর আগমণ আসন্ন। কিন্তু আমি এ সম্পর্কে অনবিহিত ছিলাম যে, তিনি তোমাদের মধ্যে (হে আরববাসী) আবির্ভুত হবেন। তাই, আমি যদি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারতাম তবে চেষ্টা করতাম যেন তাঁকে দেখার সৌভাগ্য লাভ হয়।

শেষাংশ ২১ পাতায়.....

দরূদ শরীফের কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক প্রভাব

মূল রচনা: তাহের আহমদ চিমা, অনুবাদ: আজিবুর রহমান (মুবাল্লিগ সিলসিলা)

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى
النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (سورة الاحزاب: 57)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করে, অতএব হে মোমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর এবং অধিকহারে সালাম প্রেরণ কর।

(সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৭)

উক্ত আয়াতের ব্যখ্যায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: এই আয়াত দ্বারা এটি প্রকাশ পায় যে, নবী করীম (সা.) -এর কর্ম এরূপ ছিল যে, *আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীকে সীমাবদ্ধ করতে কোন বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করেন নি।" সীমিত করেন নি। " শব্দ পাওয়া যেত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং প্রয়োগ করেন নি। অর্থাৎ তাঁর পুণ্যকর্মের প্রশংসা সীমার বাইরে ছিল। " আল্লাহ্ তা'লা এর কোন সীমা বেঁধে দিতে চান নি। " এই প্রকারে আয়াত অন্য কোন নবীর সম্মানে তিনি প্রয়োগ করেন নি।" তিনি বলেন, " তাঁর অন্তরে সেই সত্যতা ও বিশ্বস্ততা ছিল এবং তাঁর কর্মগুলি খোদার দৃষ্টিতে এতটাই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য এই আদেশ দিলেন- ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করবে।"*

(আল হাকাম, ৭ম খ-, পৃ: ২৫)

মোমেনগণের উপর আল্লাহ্র তা'লার এটি অনেক বড় কৃপা যে, সে আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও নবী করীম (সা.)-এ সীমাহীন নূর ও কল্যাণ থেকে বরকতের একটি অংশ অর্জন করার জন্য দরূদ শরীফকে একটি মাধ্যম করে রেখেছেন। যার মাধ্যমে প্রত্যেক মোমিন নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী কল্যাণ অর্জণ করতে পারে।

দরূদ শরীফের বরকত সম্বন্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্য থেকে শুধু মাত্র কয়েকটি হাদীস পাঠকগণের সামনে উপস্থাপন করছি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি তালহা নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন নবী করীম (সা.) আগমণ করলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল থেকে আনন্দের চিহ্ন স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি (সা.) বললেন, জিব্রাইল আমার নিকট এসে বলল যে, হে মুহাম্মদ! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও? যে তোমার উম্মত হতে যদি কেউ তোমার প্রতি একবার দরূপ প্রেরণ করে তাহলে আমি তার প্রতি দশবার দরূদ ও সালাম প্রেরণ করব। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কোন মুসলমান আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তখন খোদা তা'লা তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে। অতএব, এটা যখন বান্দাদের হাতে রয়েছে, সে চাইলে কম করতে পারে অথবা বৃদ্ধি করতে পারে।

(ইবনে মাজা, কিতাব আকামাতুস সালাত, বাব সালাতু আলা নবী করীম সা:)

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা দরূদ পাঠকারীদের দরূদ পাঠ করার কারণে দশটি পাপ মুছে দেন এবং তার দশটি মর্যাদা উন্নতি করে দেন।

(নিসাঈ, কিতাবুল সাহু আল ফযল ফিসসালাতি আলান নাবী সা.)

এটাও দরূদ শরীফের বরকতের অন্তর্ভুক্ত যে, এর ফলে সকল প্রকার বালা মুসিবত দূর হয়ে যায় এবং এটি পাপ থেকে রক্ষার একটি মাধ্যম।

হযরত আবি বিন কাব হতে বর্ণিত যে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার প্রতি অধিকহারে দরূদ প্রেরণ করি। আপনি নিজেই বলুন যে, আমি আপনার প্রতি কতবার দরূদ প্রেরণ করবো?' তিনি (সা.) বললেন, 'যতবার তোমার ইচ্ছা।' তিনি বলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, চার ভাগের একভাগ প্রেরণ করব?' তিনি (সা.) বললেন, 'যতবার খুশি এবং যদি তুমি এর চেয়েও অধিক দরূদ প্রেরণ কর সেটি তোমার জন্য উত্তম। ' বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দুইভাগের একভাগ?' তিনি (সা.) বললেন, 'যত খুশি প্রেরণ কর এবং যদি তুমি এর চেয়ে অধিক দরূপ প্রেরণ কর সেটা তোমার জন্য উত্তম।' বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, 'ভবিষ্যতে আমি আমার সমস্ত দোয়াকে দরূদ শরীফের মাঝে নিহিত করব।' তখন তিনি (সা.) বললেন, 'তাহলে তোমার সকল বিপদাপদ দূর হয়ে যাবে এবং তোমার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(তিরমিযি, সাফতুল কিয়ামাহ ওয়ার রিকায়েক)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, এই হাদীসটি পড়ে আমার মনে বাসনা জাগে যে, আমিও এরূপ করবো। সুতরাং একদিন কাদিয়ানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমি চাই যে, আমি আমার সকল আশা-আকাঙ্খার পরিবর্তে শুধুমাত্র দরূদ শরীফই পাঠ করব।

হুযুর (আ.) এটিকে পছন্দ করলেন এবং সেখানে উপস্থিত সকলেই আমার জন্য হাত তুলে দোয়া করলেন। তখন থেকে আমি এর উপর প্রতিষ্ঠিত যে, নিজ সকল ইচ্ছাকে দরূদ শরীফের মধ্যে নিহিত করে আল্লাহ্ তা'লা নিকট দোয়া করি।

(যিকরে হাবীব, পৃ: ২৩৪)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে হাজার বার আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে সে ইহজগতেই জান্নাতের মাঝে নিজের স্থান দেখে নিবে।

এই হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি অধিকহারে দরূদ প্রেরণকারী অতি শীঘ্রই সেই মর্যাদার অধিকারী হয় যে,

"تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا
وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ
كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ" (حم سجدہ:31)

আয়াত অনুযায়ী ইহজগতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করে, এমনকি নিজে জান্নাত লাভ করে। এর থেকে বড় কল্যাণ আর কি হতে পারে যা দরূদের মধ্যে নিহিত আছে?

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সাহাবী হযরত শেখ করম ইলাহি সাহেব পাটিইয়ালবি বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বরকতমময় যুগে একদিন যখন আমি কাদিয়ান থেকে ফিরে আসার জন্য প্রস্তত হচ্ছিলাম, তখন আমি খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমাকে কোন দোয়া শেখান। তিনি বললেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)– প্রায় সময় দরূদ শরীফ এবং ইসতেগফার অধিকহারে পড়ার উপদেশ দিতেন। এর চেয়ে বেশি আমি আর কি বলতে পারি। অতএব, যতবেশি সম্ভব দরূদ শরীফ পাঠ কর এবং চলাফেরা করার সময় ইসতেগফার পড়। এরপর থেকে সাধ্যানুযায়ী আমি এর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।

তিনি আরও বলেন, একদিন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মসজিদ মুবারকে খুদ্দামদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন এবং আমি দস্তরখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর নিকট বসেছিলাম। হযরত মৌলবী সাহেব নীচু স্বরে আমাকে বললেন, 'মগরিবের নামাযের পর কতটুকু সময় অতিবাহিত হয়ে থাকবে?' আমি বললাম, 'প্রায় এক ঘন্টা।' তিনি বললেন, 'যখন আমি কাউকে দরূদ শরীফ এবং ইসতেগফারের জন্য বলি, তখন অধিকাংশ লোক সময়ের অভাবের কারণ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু এটি আদৌ ঠিক নয়। দেখ! আমি হযরত সাহেবের কথাগুলোও মনোযোগ সহকারে শুনছি এবং প্রায় এই এক ঘন্টার মধ্যে পাঁচশ বার দরূদ পাঠ করে নিলাম। আমি আল্লাহ্র কৃপায় এই মূল্যবান নীতি নিয়ম করে মেনে চলে অনেক উপকৃত হয়েছি। মানুষ যদি অলসতা না করে তাহলে এভাবে সে সময় অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। ওয়া বিল্লাহিত তওফীক।

হৃদয়ের পূর্ণ একাগ্রতা, ভক্তি, অকৃত্রিম ভালবাসা এবং আকুলতা সহকারে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা উচিত। কেবল গণনায় অধিক হওয়া কোন মূল্য রাখে না। মূল্য রয়েছে কতটা নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে দরূদ প্রেরণ করা হল।

হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। আমার প্রতি তোমাদের দরূদ প্রেরণ করা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজেদের পবিত্রতা ও উন্নতির কারণ হবে।

এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দরূদ শরীফ প্রকৃতপক্ষে পবিত্রতা অর্জন করার একটি মাধ্যম। এর ফলে চিন্তাধারা পবিত্র হয়ে যায় এবং কর্মের সংশোধন হয়ে যায়। যদি কেউ পরীক্ষা করে দেখতে চায় তবে নিশ্চয় করতে পারে। যদি কেউ হাজার হাজার বারও দরূদ শরীফ পাঠ করে, এবং অপরদিকে সে ঘুষ খায়, বেঈমানী করে, অন্যদের কষ্ট দেয়, তাহলে (স্মরণ রাখতে হবে) দরূদ শরীফের বরকত সে নিজের হাতেই বিনষ্ট করছে।

দরূদ শরীফ পাঠ করার ফলে প্রথমত, খোদার ভালবাসা অন্তরে শক্তিলাভ করে, দ্বিতীয়ত, নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে মানুষ সেসব কর্ম করে যা নবী করীম (সা.) করেছেন। অর্থাৎ সে রসুলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নতের প্রেমিক ও আনুগত্যকারী হয়ে যায়। দরূদ শরীফ মানুষকে আধ্যাত্মিক ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ করে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরম মার্গে উপনীত করে।

অতএব, তুমি সেই মহান নবী প্রতি দিন রাত শত শত বার দরূপ প্রেরণ কর, যিনি নবীগণের সর্দার মুহাম্মদ মুস্তাফা নামে আখ্যায়িত ।

দরূদ শরীফের বরকতের ফলে মানুষ প্রাশান্তি লাভ করে, শুধু মানুষই নয় এর দ্বারা তো পশুপাখিও উপকৃত হয় ।

হায়াতে কুদুসি নামক পুস্তকের চতুর্থ খ-র ৩৬ নং পৃষ্ঠাতে হযরত গোলাম রসূল সাহেব রাজেকী সাহেবের একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে । কাদিয়ানে অবস্থানকালে একদিন হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল হযরত গোলাম রসূল রাজেকী সাহেবকে কিছু লেখার কাজ দিলেন । তখন দরূদ শরীফের বরকতের একটা ঘটনা প্রকাশ পায় । তিনি বলেন, উপদেশ অনুসারে আমি এই পুণ্যকর্মকে আরম্ভ করলাম । এবং দুপুর ১২ ঘটিকায় স্কুল থেকে ফিরে এসে বাকি সময়টা লেখালেখির কাজে ব্যায় করতাম । তখন আমি হযরত নওয়াব মুহাম্মদ আলি খান সাহেবের শহরে অবস্থিত ঘরের একটি কামরায় অবস্থান করতাম । উক্ত কামরার বারান্দায় দুটো পায়রা ডিম পেড়েছিল । একদিন এক চাকর ঘর পরিষ্কার করার সময় বাসাটাকে ভেঙে দিলে ডিমগুলো পড়ে ভেঙ্গে যায় । তখন আমি লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলাম । যখন পায়রা দুটি নিজেদের বাসা খালি এবং ডিমগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় দেখল, তখন তারা আবেগাপ্লুত হয়ে এদিক ওদিক উড়তে আরম্ভ করল । তাদের এক কষ্টদায়ক শব্দ ও অস্থিরতা আমার উপর এক গভীর প্রভাব ফেলল । তক্ষুণি আমি লেখা বন্ধ করে তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম । আর সজল নয়নে তাদের দুঃখের শরিক হয়ে পড়লাম । আমি দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করতে থাকলাম, এই অবলা পাখিদেরকে কিভাবে তুষ্ট করব । কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পেলাম না । অবশেষে আমি ভাবলাম, যেহেতু দরূদ শরীফ গ্রহণযোগ্য একটি দোয়া । কাজেই, যদি আমি তাকে এই উদ্দেশ্য পাঠ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা তার পুণ্যকে আমার পরিবর্তে সেই পাখির জন্য প্রশান্তির কারণ হয় । তাহলে হয়তো সেই মূক বাকশক্তিহীন পাখির কষ্ট কিছুটা উপশম হবে । সুতরাং এই নিয়ত করে আমি দরূদ শরীফ পাঠ করতে আরম্ভ করলাম । হঠাৎ দেখি সেই পাখির কষ্ট দূর হয়ে গেল এবং তারা শান্ত হয়ে এক স্থানে বসে পড়ল । তাদের এই নীরবতা দেখে আমি পুনরায় কলম ধরলাম এবং দরূদ শরীফ পাঠ বন্ধ করে লেখার কাজে মনোনিবেশ করলাম । কিন্তু কয়েকটি লাইন লেখা হতে না হতেই দেখি পায়রা দুটি আবার অস্থির হয়ে পড়ল । অস্থিরতা ও আকুলতা দেখে আমি পুনরায় দরূদ শরীফ পাঠ করতে লাগলাম । যার ফলে তারা আবার শান্ত হয়ে বসে পড়ল । কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন আমি লেখা আরম্ভ করলাম, হঠাৎ দেখি তাদের অবস্থা পুনরায় পাল্টে গেল । তিন চার বার এরূপ হতে থাকে । তারপর যখন আযান হল, আমি মসজিদে চলে যাই, আর পায়রাগুলোও উড়ে যায় ।'

বর্তমান যুগে সবচেয়ে বেশি আঁ হযরত (সা.)–এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার সাথে দরূদ প্রেরণকারী ছিলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ (আ.) । এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর বরকত অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন । সুতরাং তিনি (আ.) বলেন, একদিন এমন ইত্তেফাক হয় যে, নবী করীম (সা.)এর প্রতি দরূদ পাঠ করায় মগ্ন ছিলাম, কেননা আমার বিশ্বাস ছিল যে, খোদা তা'লার পথ অতি সূক্ষ্ম এবং তা নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যম ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয় । যেভাবে খোদা তা'লা বলেছেন- 'ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা' (মায়েদাঃ ৩৬) কিছুকাল পর আমি দিব্যদর্শনে দেখলাম, দুই পানি বহনকারী এসেছে যাদের মধ্যে একজন বাইরের পথ দিয়ে এবং অপর জন ভিতরের পথ দিয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করেছে । তাদের কাঁধে নূরের (জ্যোতির) মশক রয়েছে আর তারা বললে 'হাযা বেমা সাল্লায়াত আলা মুহাম্মদ' । অর্থাৎ এই বরকতা সেই দরূদের কারণে যা তুমি মহম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে ।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খ--২২, পৃঃ ১৩১)

তিনি আরও বলেন, 'একবার আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি । ১৬ দিন যাবৎ পায়ূপথ দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে । এমন কষ্ট হচ্ছিল যা বর্ণনার অতীত । যখন রোগ বৃদ্ধি পায়, তখন খোদা তা'লা আমাকে ইলহামের মাধ্যমে বলেন, এখন চিকিৎসা ছেড়ে দাও এবং নদীর সেই বালি যার মধ্যে পানিরও মিশ্রন থাকে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এবং দরূপ পাঠ করে নিজের শরীরে মাখ । অতএব অতিশীঘ্র নদী থেকে এরূপ বালি আনা হল এবং আমি এই বাক্য **'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম'** ও দরূদ শরীফ পাঠ করে সেই বালি আমার গায়ে মাখতে লাগলাম । যতবার সেই বালি আমার গায়ে স্পর্শ করত, মনে হত আমার শরীর যেন আগুন থেকে মুক্তি পাচ্ছে । সকাল পর্যন্ত আমার সমস্ত অসুখ দূর হয়ে গেল ।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খ--২২, পৃঃ ১৩১)

তিনি আর এক জায়গায় বলেন, দরূদ যা দৃঢ়তা লাভের এক অতি উত্তম মাধ্যম, একে অধিকহারে পাঠ কর, কিন্তু রীতি রেওয়াজ স্বরূপ নয় । নবী করীম (সা.)-এর সৌন্দর্য ও দয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ কর । এবং তিনি (সা.)-এর মর্যাদা ও উন্নতির জন্য এবং তাঁর সফলতার জন্য পাঠ কর । এর ফলশ্রুতিতে তোমরা গ্রহণীয়তার সুস্বাদু ফল অর্জন করবে ।"

(মালফুযাত, ৩য় খ-, পৃঃ ৩৮)

আমাদের বর্তমান খলীফাও জামাতের সদস্যদেরকে প্রতিনিয়ত দরূদ শরীফ পাঠ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন । শত বার্ষিকী খিলাফত জুবিলীর শুভলগ্নে হুযুর আনোয়ার (আই.) যে সব দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করিয়েছিলেন সেখানে দরূদ শরীফের বিষয়ে বলেছিলেন যে, দিনে কমপক্ষে ৩৩ বার যেন দরূপ পাঠ করা হয় । এবং ২০১৪ সালের ১১ই মে খুতবা জুমায় যখন সেই সব দোয়ার পুনরাবৃত্তি করেন তখন দরূদ শরীফ অধিকহারে পাঠ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । এমনকি যখন শত্রুপক্ষরা নবী করীম (সা.) -এর বরকতময় ব্যক্তিত্বের উপর আক্রমণ হানে তখন হুযুর আনোয়ার (আই.) জামাতের সদস্যদেরকে নবী করীম (সা.)-এর প্রতি দরূপ প্রেরণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করান ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর প্রতি কোটি কোটি বার দরূদ প্রেরণ কর । অতএব, যতক্ষণ দরূদের প্রতি দৃষ্টি থাকবে, ততদিন তার বরকতের ফলে জামাতের উন্নতি এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত এবং তার সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকবে । বর্তমানে ইসলাম ধর্মের শত্রুরা নবী করীম (সা.)-এর নামের উপর নোংরামি করার চেষ্টায় রত আছে । তাদের এই প্রচেষ্টা নিজেদের খারাপ পরিণাম ছাড়া আর কোন ফল দেবে না । কিন্তু তাদের এই বিফল প্রচেষ্টার ফলে আরা যারা আহমদী এই প্রতিজ্ঞা যেন করি যে, আমরা নবী করীম (সা.)-এর প্রতি কোটি কোটি বার দরূদ প্রেরণ করব ।

(আল ফযল, ১৮ই এপ্রিল, ২০০৮)

এরপর তিনি বলেন: অতএব এমন সময় যখন কিনা আঁহযরত (সা.) বিরুদ্ধে কদর্য আক্রমণের এক ঝড় বয়ে চলেছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার ফেরেশতারা তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করছেন । আমরা যারা নিজেদেরকে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রাণদাস ও নিষ্ঠাবান প্রেমিক এবং শেষ যুগের ইমামের জামাতের সঙ্গে যুক্ত রেখেছি, তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হল নিজেদের দোয়াকে দরূদে রূপায়িত করা । এবং পরিমণ্ডলে নিষ্ঠাপূর্ণ দরূদ এত পরিমাণে ছড়িয়ে দাও যে, আকাশ ও বাতাসের প্রতিটি কণা দরূদ দ্বারা সুরভিত হয়ে ওঠে । আর আমাদের সমস্ত দোয়া যেন এই দরূদের মধ্যস্ততার কল্যাণে খোদার দরবারে পৌঁছে গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করে । আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের এর প্রতি আমাদের এমন অনুরাগ ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয় ।"

(খুতবাতে মসরূর, ৪র্থ খ-, পৃঃ ১১৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দরূদ শরীফের বরকত ও এর আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্পর্কে বলেনঃ দরূদ শরীফের কল্যাণরাজি বলে শেষ করা যাবে না । আমার নিজেরই এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে । আমার উপর খোদার যে অনুগ্রহ হয়েছে তাতে দরূদ শরীফের বরকত এবং প্রভাবের অংশ বেশি । দরূদ শরীফ পাঠকারী ব্যক্তি পারলৌকিক পুণ্যের ভাগীই হয় না, বরং ইহ জগতেও সম্মানের অধিকারী হয় । কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এমন দরূদের অনুরাগী নই যা মানুষকে খোদা সম্পর্কে উদাসীন করে দেয় আর সে মনে করে বসে 'কাযা ও কদর'-এর নিয়ন্ত্রণ খোদার হাতে নেই, বরং ভুরি ভুরি অংশীবাদিরা খোদার সেই একাধিপত্যে দখল বসায় । বাক্যের এই অংশে হুযুর (আ.)-এর কথায় আবেগ ও উত্তেজনা স্পষ্টভাবে ধরা দিচ্ছে । তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে যায় এবং বলেন যে, নিঃসন্দেহে দরূদ শরীফের অনেক বরকত ও কল্যাণ রয়েছে এবং মানুষের উপর এর বরকত অধিকহারে অবতীর্ণ হয় । এবং এর বরকতের ফলে দোয়া কবুল হয় এবং এর অগণিত কল্যাণ রয়েছে । কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা তা'লার মুখাপেক্ষীহীনতা সম্পর্কে মানুষের উদাসীন হওয়া উচিত নয় । এমনও এক সময় ছিল, যে নবীর উপর দরূদ প্রেরণ করে মানুষ কল্যাণ লাভ করত, সেই তাঁকেও খোদার আদেশের সামনে নত মস্তক হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না । অতএব, অধিকহারে দরূদ পাঠ কর । কিন্তু সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখবে যে, আমরা যেন খোদা তা'লার সত্তাকে সর্বশক্তিমান এবং অমুখাপেক্ষী জ্ঞান করি এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর ঈমানের ভিত রাখি ।"

(মাকতুবাত, হযরত মৌলানা মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব হালালপুরী, দরূদ শরীফ পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত, ২৯২)

অবশেষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর দোয়া সংবলিত শব্দ দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করছি । তিনি বলেন, 'হে আমার প্রিয় খোদা! তুমি সেই প্রিয় নবীর উপর প্রতি রহমত ও দরূদ প্রেরণ কর যা পৃথিবীর সৃষ্টি হতে তুমি কাহারো প্রতি প্রেরণ কর নি । হে খোদা! যদি এই মহান নবী পৃথিবীর বুকে আগমন না করতেন, তাহলে যত ছোট বড় নবী পৃথিবীতে আগমণ করেছেন আমাদের নিকট তাদের সত্যতার কোন দলিল থাকত না । " (ইতমামে হুজ্জাত, পৃঃ ২৮)